বিশেষ সংখ্যা

আগস্ট ২০২২ ■ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৯

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

কান্না ঝরানো সেই রাত

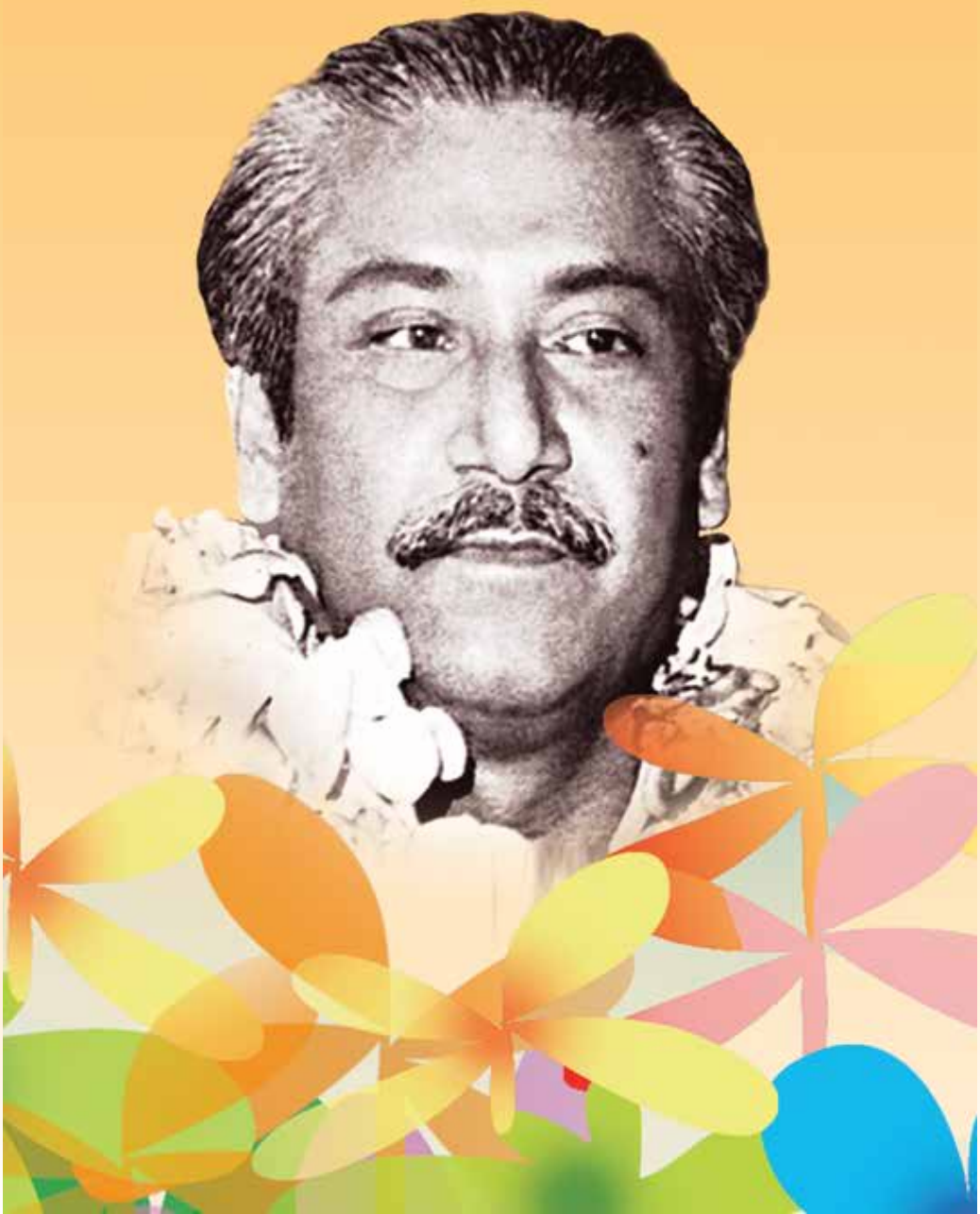

রাফান ইবনে মেহেদী, পঞ্চম শ্রেণি, বিএএফ শাহীন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

তাহমিদ আজমাইন আহনাফ, সপ্তম শ্রেণি, আইডিয়াল ইংলিশ ভার্সন স্কুল, ঢাকা

সম্পাদকীয়

নবারুণের বন্ধুরা, পনেরোই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে আমাদের প্রিয় নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। বাদ যায়নি ছোটো শিশু রাসেলও। এই হত্যাকাণ্ড বিশ্বাসঘাতকতার একটি চরম দৃষ্টান্ত। ঘাতকরা সেদিন ভেবেছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেই বাংলাদেশ আর এগিয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু না তারা পারেনি। মুছে ফেলা যায়নি তাঁর নাম। তিনি সবসময়ই আমাদের মাঝে আছেন, থাকবেন। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মকে প্রেরণা জুগিয়ে যাবেন বঙ্গবন্ধু।

৮ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯২তম জন্মবার্ষিকী। যে মহীয়সী নারীর সাহস জোগানোর ফলেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের অমর ভাষণ দিয়েছিলেন এবং বাঙালি জাতিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। জন্মদিনে বঙ্গমাতাকে নবারুণের পক্ষ থেকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

বন্ধুরা তোমরা বেশি বেশি বই পড়বে। মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে সঠিক ইতিহাস জানবে। নবারুণের সাথে থাকবে।

সবাই ভালো থেকো বন্ধুরা। তোমাদের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

সহ-সম্পাদক
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

সূচিপত্র

নিবন্ধ

কান্না ঝরানো সেই রাত/আনজীর লিটন ০৩
বঙ্গবন্ধু মানে উদার আকাশ/মাহবুব রেজা ০৯
স্বাধীনতার মহানায়ক/মো. সিরাজুল ইসলাম ১৭
মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা/হাছিনা আক্তার ২৩
প্রতিবাদী বঙ্গবন্ধু/সাহিদা বেগম ৩০
চেতনায় বঙ্গবন্ধু/শেলি শেলিনা ৩৬
তাঁকে আমি চোখে দেখিনি/রহিমা আক্তার মৌ ৪২
সে...ই টেলিফোন/সাঈদুল ইসলাম ৫৪
বঙ্গবন্ধু রেল জাদুঘর/সুমন প্রামানিক ৫৬
মুখোমুখি বাবা ও ছেলে/ইমরুল ইউসুফ ৫৭
চলো যাই জাতির পিতার সমাধি/হাবিবা আক্তার ৬৩
সেই বজ্রকণ্ঠ/মমতাজ আহাম্মদ ৬৫
শক্তি ও প্রেরণার মাস/খায়রুল বাবুই ৬৭
বঙ্গবন্ধু আইল্যান্ড : প্রাকৃতিক স্বর্গরাজ্য/শাহানা আফরোজ ৬৯
ধাতব মুদ্রায় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি/মেজবাউল হক ৭০

গল্প

সমাজ পাঠে বঙ্গবন্ধু/প্রণব মজুমদার ১২
পানকৌড়ি/আশরাফ আলী চারু ২৫
রূপনের বঙ্গবন্ধু স্মরণ/কাজী কেয়া ২৭
খোকা খুব পাখি ভালোবাসত/দিলরুবা নীলা ৩৩
মামুনের স্বপ্ন/আজহার মাহমুদ ৪৬

মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস

রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী/মুস্তাফা মাসুদ ৪৯

ছবিতে বঙ্গবন্ধু

ছবির অ্যালবাম ৩৮

কবিতা ও ছড়া

০৮ গোপেশচন্দ্র সূত্রধর/গোলাম নবী পান্না
১৫ অমিত বড়ুয়া/সৈয়দা নাজমুন নাহার
১৬ সালাম হাসেমী/ফারুক হাসান/আ.ফ.ম.মোদাচ্ছের আলী
৪০ জিয়া হক/চন্দনকৃষ্ণ পাল
৪১ উৎপলকান্তি বড়ুয়া /বোরহান মাসুদ/সুফিয়া শিউলি
৪৮ বাবুল তালুকদার/মো. রকিব খান

ছোটোদের ছড়া

৪০ লাবিবা তাবাস্‌সুম রাইসা/আরিবা ইবনাত
৪৮ মাহমুদুল হাসান মনি
৬১ নওশিনা ইসলাম, আবরার হামিদ
৬২ নিষাদ আলম/মো. মোস্তাকিম হোসাইন মৃদুল
রাকিবুল হাসান/ অর্থি বড়ুয়া
৬৮ সাকিবুল আলম

ছোটোদের আঁকা

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : রাফান ইবনে মেহেদী, তাহমিদ আজমাইন আহনাফ
১৪ সৈয়দ ফারসাদ নেয়ামুল সীন
৬৫ জয়া ওয়ালিয়া
৭৯ আব্দুল কাদের জিলানী/জান্নাতুল নাঈম
৮০ ফারিন আজিজ/রেজওয়ান আল রাহাত

সাফল্য প্রতিবেদন

৭১ বাংলাদেশের জয়/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৭২ বই দাদু/রাইসুল আলম
৭৩ বাবার ভরসা মুনিরা/জান্নাতে রোজী
৭৪ দুধের পুষ্টিতথ্য/মো. জামাল উদ্দিন
৭৫ দশদিগন্ত/সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
৭৭ বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় Nobarun Potrika আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে।

এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

কান্না ঝরানো সেই রাত

আনজীর লিটন

মুজিব ছাড়া বাংলা বলো
কেমন করে মানতে পারি?
একটা জাতির একটা মুজিব
কোত্থেকে আর আনতে পারি?

এমনই বেদনার পঙ্‌ক্তিমালা নিয়ে আমাদের কাছে আসে ১৫ই আগস্ট। জাতীয় শোক দিবস। বাঙালির জীবনে শোকাবহ দিন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাঙালির চোখে কান্না ঝরানো রাত এসেছিল। সেদিনের সেই রাতে রাজধানী ঢাকায় সংঘটিত হয়েছিল ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। এদিন স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, বাঙালির মহানায়ককে হত্যা করেছিল ক্ষমতালোভী নরপিশাচ কুচক্রী মহল।

বাঙালির মহান নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিরঞ্জীব, তাঁর চেতনা অবিনশ্বর। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে শাণিত বাংলার আকাশ-বাতাস, জল-সমতল। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিনাশী চেতনা ও আদর্শ চির প্রবহমান থাকবে। জাতির পিতা চেয়েছিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। এই বাংলাদেশের জন্য ছিল তাঁর যত ভালোবাসা। এই ভালোবাসা দিতে গিয়ে তাঁকে পোহাতে হয়েছে জেল-জুলুম নির্যাতন। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামমুখর জীবন সে কথাই বলে। তাঁর জীবনের পাতায়-পাতায় ছড়িয়ে থাকা এসব দিনলিপি-ঘটনাপঞ্জি আমাদের ইতিহাস।

যে মহান নেতা আমাদের স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ গড়ে দিলেন, সেই নেতা প্রাণ হারালেন ঘাতকের বুলেটে, স্বাধীন দেশে, নিজ গৃহে, ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সালে। দেশ স্বাধীন হবার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় বাঙালি জাতির ইতিহাসে এল শোকাবহ একটি দিন। এদিন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার মধ্য দিয়ে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিকে থমকে দেওয়া হয়েছিল। থমকে গেল বাঙালির প্রাণ! দেশ ফের চলা শুরু করল উলটো পথে, অন্ধকারের দিকে। বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর গোটা বিশ্বে নেমে এসেছিল শোকের ছায়া। হত্যাকারীদের প্রতি ছড়িয়ে পড়েছিল ঘৃণার বিষবাষ্প। আবারও প্রতিরোধ গড়ে তুলল বাঙালি জাতি। দূর হলো অন্ধকারের কালো অধ্যায়। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ আমরা এগিয়ে চলছি আলোর পথে।

বঙ্গবন্ধু ছাড়াও ১৫ই আগস্ট রাতে ধানমন্ডির বাড়িতে তার সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, ছেলে শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শিশুপুত্র শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ভাই শেখ আবু নাসের, বঙ্গবন্ধুর ফোন পেয়ে তাঁর জীবন বাঁচাতে ছুটে আসা নিরাপত্তা কর্মকর্তা কর্নেল জামিল, এসবির কর্মকর্তা সিদ্দিকুর রহমান ও সেনা সদস্য সৈয়দ মাহবুবুল হককে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবলীগ নেতা শেখ ফজলুল হক মনির বাসায় হামলা চালিয়ে তাঁকে, তাঁর অন্তঃসত্তা স্ত্রী আরজু মনি, বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায় হামলা করে তাঁকে ও তাঁর কন্যা বেবী, পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, নাতি সুকান্ত বাবু, সেরনিয়াবাতের বড়ো ভাইয়ের ছেলে সজীব সেরনিয়াবাত এবং এক আত্মীয় রিন্টু খানকে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার এবং নিকটাত্মীয়সহ ২৬ জনকে ওই রাতে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা সে সময় তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করায় তাঁরা প্রাণে বেঁচে যান।

১৫ই আগস্ট ১৯৭৫-এর সেই রাতের সাক্ষী আবদুর রহমান শেখ রমা। আদালতে দেওয়া জবানবন্দিতে তিনি তুলে ধরেন নির্মম হত্যাযজ্ঞের কথা। সেদিন চিৎকার করে রাসেল বলেছিল, আমি মার কাছে যাব। রমার স্বাক্ষরিত জবানবন্দি।

'আমি ১৯৬৯ সালে কাজের লোক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে আসি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভোর পাঁচটায় বঙ্গবন্ধু নিহত হন। তখন আমি বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে থাকতাম। ওই দিন, অর্থাৎ ঘটনার দিন রাত্রে আমি এবং সেলিম দোতলায় বঙ্গবন্ধুর বেডরুমের সামনে বারান্দায় ঘুমিয়ে ছিলাম। আনুমানিক ভোর পাঁচটার দিকে হঠাৎ বেগম মুজিব দরজা খুলে বাইরে আসেন এবং বলেন, যে সেরনিয়াবাতের বাসায় দুষ্কৃতকারীরা আক্রমণ করেছে। ওই দিন তিন তলায় শেখ কামাল এবং তার স্ত্রী সুলতানা ঘুমিয়ে ছিল। ওই দিন শেখ জামাল ও তার স্ত্রী রোজী এবং ভাই শেখ নাসের দোতলায় ঘুমিয়ে ছিল। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর স্ত্রী এবং শেখ রাসেল দোতলায় একই রুমে ঘুমিয়ে ছিল। নিচতলায় পিএ মহিতুল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মচারী ছিল। বেগম মুজিবের কথা শুনে আমি তাড়াতাড়ি লেকের পাড়ে যেয়ে দেখি, কিছু আর্মি গুলি করতে করতে আমাদের বাড়ির দিকে আসিতেছে। তখন আমি আবার বাসায় ঢুকি এবং দেখি পিএ/ রিসিপশন রুমে বঙ্গবন্ধু তার সঙ্গে কথা বলিতেছে। আমি পিছনের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় এসে দেখি বেগম মুজিব দোতলায় ছোটাছুটি করছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে তিন তলায় যাই এবং আমাদের বাসা আর্মিরা আক্রমণ করেছে বলে কামাল ভাইকে উঠাই। কামাল ভাই তাড়াতাড়ি একটা প্যান্ট ও শার্ট পরে নিচের দিকে যায়। আমি তার স্ত্রী সুলতানাকে নিয়ে দোতলায় আসি। দোতলায় গিয়ে একইভাবে আমাদের বাসা আর্মিরা আক্রমণ করেছে বলে জামাল ভাইকে উঠাই। তিনি তাড়াতাড়ি প্যান্ট, শার্ট পরে তার মার রুমে যান। সঙ্গে তার স্ত্রীও যান। এই সময়ও খুব গোলাগুলি হচ্ছিল।

এক পর্যায়ে কামাল ভাইয়ের আর্তচিৎকার শুনতে পাই। একই সময় বঙ্গবন্ধু দোতলায় আসিয়া রুমে ঢোকেন এবং দরজা বন্ধ করে দেন। প্রচণ্ড গোলাগুলি একসময় বন্ধ হয়ে যায়। তারপর বঙ্গবন্ধু দরজা খুলে আবার বাইরে এলে আর্মিরা তাঁর বেডরুমের সামনে চারপাশে তাহাকে ঘিরে ফেলে। আমি আর্মিদের পিছনে ছিলাম। আর্মিদের লক্ষ্য করে বঙ্গবন্ধু বলেন,

> প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিনাশী চেতনা ও আদর্শ চির প্রবহমান থাকবে

'তোরা কী চাস? কোথায় নিয়ে যাবি আমাকে?' তারা বঙ্গবন্ধুকে তখন সিঁড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। সিঁড়ির ২/৩ ধাপ নামার পর নিচের দিক থেকে অনেক আর্মি বঙ্গবন্ধুকে গুলি করে।

গুলি খেয়ে সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়েন। আমি তখন আর্মিদের পিছনে ছিলাম। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কী করো?' উত্তরে আমি বলি, কাজ করি। তখন তারা আমাকে ভিতরে যেতে বলে। আমি বেগম মুজিবের রুমের বাথরুমে গিয়ে আশ্রয় নিই। সেখানে বেগম মুজিবকে বলি বঙ্গবন্ধুকে গুলি করেছে। ওই বাথরুমে শেখ কামালের স্ত্রী সুলতানা, শেখ জামাল ও তার স্ত্রী রোজী, শেখ রাসেল, বেগম মুজিব ও বঙ্গবন্ধুর ভাই নাসের এবং আমি আশ্রয় নিই। শেখ নাসের ওই বাথরুমে আসার আগে তার হাতে গুলি লাগে, তার হাত থেকে তখন রক্ত ঝরছে। বেগম মুজিব শাড়ির আঁচল ছিড়ে তার রক্ত মুছেন। এরপর আর্মিরা আবার দোতলায় আসে এবং দরজা পিটাতে থাকলে বেগম মুজিব দরজা খুলিতে যান এবং বলেন, 'মরলে সবাই একই সাথে মরব।' এই বলে বেগম মুজিব দরজা খুললে আর্মিরা রুমের ভেতর ঢুকে পড়ে এবং শেখ নাসের, শেখ রাসেল, বেগম মুজিব এবং আমাকে নিচের দিকে নিয়ে আসছিল। তখন সিঁড়িতে বেগম মুজিব বঙ্গবন্ধুর লাশ দেখে বলেন, 'আমি যাব না, আমাকে এখানেই মেরে ফেল।' এই কথার পর আর্মিরা তাঁকে দোতলায় তাঁর রুমের দিকে নিয়ে যায়। একটু পরেই ওই রুমে গুলির শব্দসহ মেয়েদের আর্তচিৎকার শুনতে পাই। আর্মিরা নাসের, রাসেল ও আমাকে নিচতলায় এনে লাইনে দাঁড় করায়। সেখানে সাদা পোশাকের একজন পুলিশের লাশ দেখি। নিচে নাসেরকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কে? তিনি শেখ নাসের বলে পরিচয় দিলে তাহাকে নিচতলায় বাথরুমে নিয়ে যায়। একটু পরেই গুলির শব্দ ও তার মাগো বলে আর্তচিৎকার শুনতে পাই। শেখ রাসেল 'মার কাছে যাব' বলে তখন কান্নাকাটি করছিল এবং পিএ মহিতুল ইসলামকে ধরে বলছিল, 'ভাই, আমাকে মারবে না তো?' এমন সময় একজন আর্মি তাহাকে বলল, 'চলো, তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাই। এই বলে তাহাকে দোতলায় নিয়ে যায়। একটু পরেই কয়েকটি গুলির শব্দ ও আর্তচিৎকার শুনতে পাই।

লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় সেলিমের হাতে এবং পেটে দুইটি গুলির জখম দেখলাম। এরপর দেখলাম কালো পোশাক পরিহিত আর্মিরা আমাদের বাসার সব জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। তখন ডিএসপি নূরুল ইসলাম এবং পিএ/রিসিপশনিস্ট মহিতুল ইসলামকে আহত দেখি। এরপরে আমাদের বাসার সামনে একটা ট্যাংক আসে। ট্যাংক থেকে কয়েকজন আর্মি নেমে ভিতরের আর্মিদের লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করে ভিতরে কে আছে, উত্তরে ভিতরের আর্মিরা বলে, All are finished. অনুমান বেলা ১২টার

দিকে আমাকে ছেড়ে দিবার পর আমি প্রাণভয়ে আমার গ্রামের বাড়ি টুঙ্গিপাড়া চলে যাই।'

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারকে যারা হত্যা করেছে তাদের বিচার যেন না হয় সেজন্যে ১৯৭৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। দীর্ঘ ২১ বছর ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের পদক্ষেপ নেন। ১০ই নভেম্বর ১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি বিল উত্থাপিত হয়। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ২১ বছর ১ মাস ১৬ দিনের পর জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স বাতিল বিল গৃহীত হয়। এতে করে হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারে মোট ১৫-জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। আসামিরা হলো ১. লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, ২.লে. কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, ৩.লে. কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ (আর্টিলারি), ৪.লে. কর্নেল আবদুর রশিদ, ৫.মেজর বজলুল হুদা, ৬.লে. কর্নেল শরিফুল হক ডালিম, ৭. মেজর শরিফুল হোসেন ওরফে শরফুল হোসেন, ৮. লে. কর্নেল এ. এম. রাশেদ চৌধুরী, ৯. লে. কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ (ল্যান্সার), ১০.লে. কর্নেল এস. এইচ.এম. বি.নূর চৌধুরী, ১১. লে. কর্নেল আব্দুল আজিজ পাশা, ১২.ক্যাপ্টেন মো.কিসমত হাশেম, ১৩. ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন আনসার, ১৪. ক্যাপ্টেন আবদুল মাজেদ, ১৫. রিসালদার মোসলেমউদ্দিন ওরফে মোসলেউদ্দিন। বিচার প্রক্রিয়ায় হত্যাকারীদের মধ্যে ২০১০ সালের ২৮শে জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর পাঁচ খুনি ফারুক রহমান, সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, বজলুল হুদা, মহিউদ্দিন আহমেদ ও একেএম মহিউদ্দিনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। অন্যতম আসামি মাজেদকে ভারত থেকে দেশে এলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০১৯ সালের ১২ই এপ্রিল তার ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

১৯৭৫-এ ১৫ই আগস্টের পর থেকে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক বাড়িটি আজ শুধুই স্মৃতিচিহ্ন। এই বাড়ির প্রতিটি পরতে পরতে লেগে আছে রক্তের দাগ। সাজানো ঘর, আলমারি, বুকসেলফ, রান্নাঘর, চেয়ারটেবিল, ইট-পাথরের দেয়াল আর সিঁড়ি সবকিছুই আজ রক্তাক্ত। আর এই রক্তাক্ত ইতিহাসে লেখা আছে বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের জন্যে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের আত্মদানের কথা। বাঙালির অন্তর জুড়ে আজ কবিতার পঙ্‌ক্তিমালায় রচিত হয় শোকের অনুভূতি–

তুমি কোন সে ঘাতক?
যে তুমি কেড়ে নিলে এ দেশের স্বপ্নজয়ী পিতাকে?
তুমি কোন সে ঘাতক?
যে তোমার বুলেটে ছিন্ন হয়ে গেল হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি,
আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
তুমি কোন সে ঘাতক?
যে তুমি কেড়ে নিলে।
বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে
কেড়ে নিলে ভাইকে, স্বজনকে
কেড়ে নিলে ছোট্ট সোনা ভাই রাসেলকে! ■

ছড়াকার, শিশুসাহিত্যিক ও
সাবেক পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

তাঁর কাছে এই জাতি

গোলাম নবী পান্না

স্বদেশের প্রতি যার টান অফুরান
কখনও ফুরায় না তাঁর অবদান।
এ জাতির ভাবনায় মায়া দেন ঢেলে
এগিয়েই যান তিনি পিছুটান ফেলে।
মৃত্যুর ভয়টাকে জয় করে শেষে
শান্তির বার্তাটা দিয়ে যান দেশে।
স্বাধীনতা,ভাষা আর বিজয়ের মাঝে
স্বপ্নটা এঁকেছেন সফল এ কাজে।
সফলতা নিয়ে বুকে সাহসের সাথে
জাতি এক বন্ধনে তাই মালা গাঁথে।
আর তাতে অবদান যাঁর নামে লেখা
একজন ছাড়া আর যায় না তো দেখা।
তিনি 'শেখ মুজিবুর রহমান' যিনি
তাঁর কাছে এই জাতি আজীবন ঋণী।

পঁচাত্তরের বানে ভাসছে

গোপেশচন্দ্র সূত্রধর

কাঁদছে আকাশ কাঁদছে বাতাস
কাঁদছে পানের বাটা
জাতির পিতা খুন হয়েছে
কাঁদছে পৃথিবীটা।

ভোর বাতাসে খবর আসলো
নেই যে বেঁচে কেউ
সেই খবরটা শুনে কাঁদছে
নীল সমুদ্রের ঢেউ।

চোখের জলে ভাসছে সবাই
ভাসছে গাছের সারি
কেউ যে আর বেঁচে নেই
শেখ মুজিবের বাড়ি।

পঁচাত্তরের বানে ভাসছে
ধানমন্ডির ঐ বাড়ি
কে যে কোথায় আছো তোম্‌রা
এসো তাড়াতাড়ি।

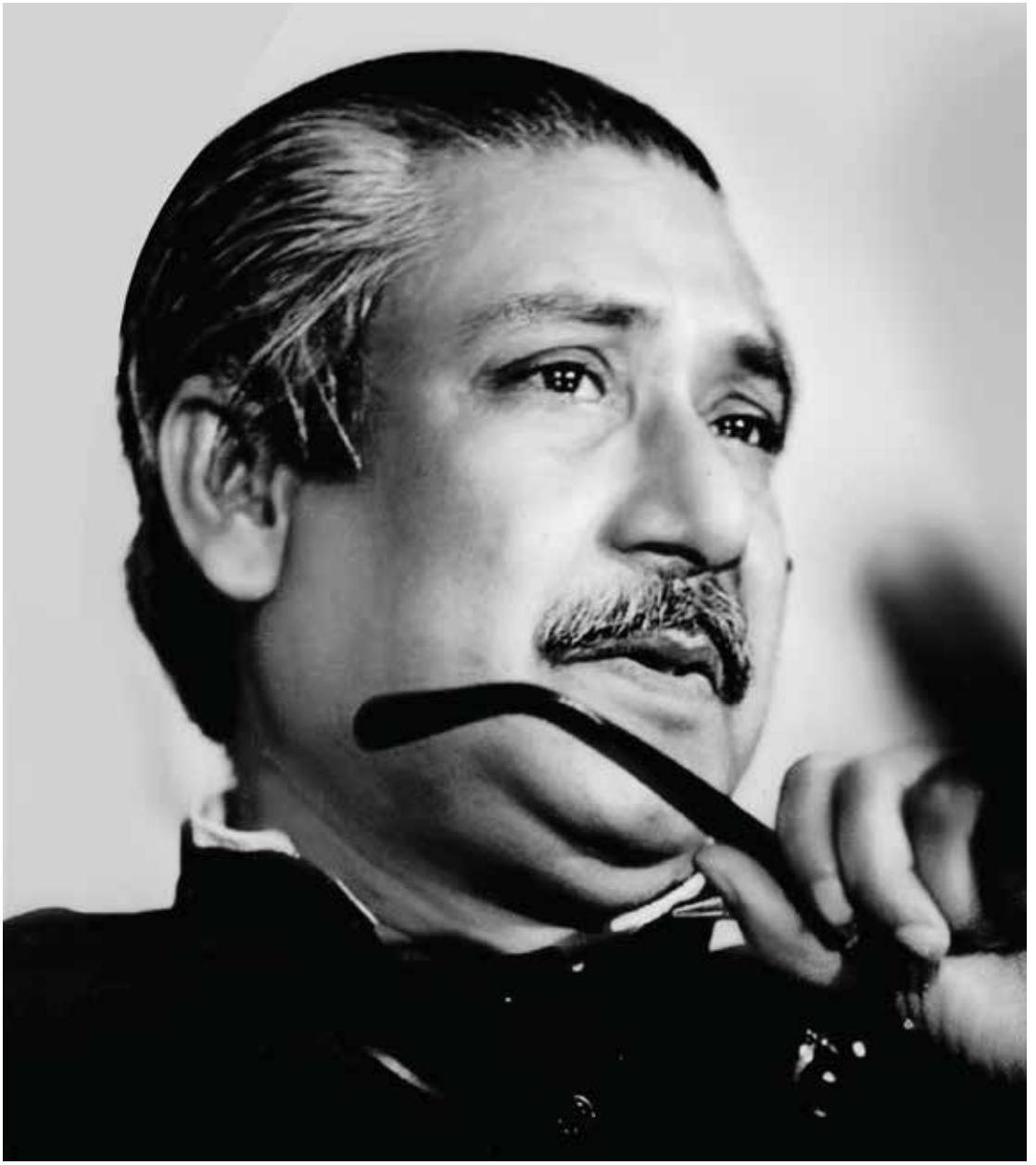

বঙ্গবন্ধু মানে উদার আকাশ

মাহবুব রেজা

সারাটা জীবন নিজের জীবন বাজি রেখে এই বাংলার শোষিত, নিপীড়িত মানুষের পক্ষে লড়াই- সংগ্রাম করেছেন। বঙ্গবন্ধু সংশ্লিষ্ট গবেষকরা বলছেন, বঙ্গবন্ধু মানুষের অধিকার- দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সামরিক শাসকরাও তাঁকে ভয়

পেতেন, সমঝে চলতেন। তাদের কাছে বঙ্গবন্ধু ছিলেন ভীষণ প্রতিবাদী আর একরোখা নেতা। যেখানে তিনি বাঙালির স্বার্থ আর স্বাধীনতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। ফলে সামরিক শাসকরা তাঁকে ভয়ই পেতেন। বঙ্গবন্ধু গবেষকরা বলছেন, দৃঢ়চেতা বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের এই কঠিন রূপের বাইরেও আরেকটি দিক হলো তিনি ছিলেন ভিন্ন এক মানুষ যাঁর সঙ্গে আর অন্য কিছু মেলানো যায় না। কোমলে কঠিন এক নেতা ছিলেন তিনি। ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু ছিলেন একেবারে ব্যতিক্রম। কী রকম ব্যতিক্রম?

পরিবেশ আর প্রকৃতির প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা ছিল প্রবল। কারণ তিনি তাঁর ছোটোবেলা থেকে দেখে এসেছেন প্রকৃতি সব সময় মানুষের বিপদে- আপদে, সুখে-দুঃখে নিবিড়ভাবে তাঁর পাশে থাকে ছায়ার মতো, একান্ত স্বজনের মতো। প্রকৃতি যেন মানুষের প্রতিবেশী। শৈশবের সাহিত্যপাঠ তাঁকে প্রকৃতি চিনিয়েছে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান-কবিতা তাঁকে আকর্ষণ করত অনেক বেশি। বাংলা সাহিত্যসহ বিশ্বসাহিত্যের অনেক লেখকের রচনা তাঁকে দেশপ্রেম আর প্রকৃতিপ্রেমে উজ্জীবিত করেছে। ফলে তিনি নিজের ভেতরে লালন করেছেন দেশকে, প্রকৃতিকে আর দেশের মানুষকে। ফলে সারাটা জীবন প্রকৃতি আর সবুজ- শ্যামল পরিবেশের জন্যও তাঁর অন্তর কেঁদেছে।

ছোটোবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অসম্ভব রকমের কোমল মনের মানুষ। সহজসরল মানুষের প্রতিকৃতি বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন অবিকল সে রকমের। তাঁর ছোটোবেলা কেটেছে শান্ত-সবুজ গ্রামীণ প্রকৃতি আর পরিবেশে। গ্রামের নিটোল প্রকৃতি, গাছগাছালি-পাখপাখালি আর অফুরান স্নিগ্ধ সুন্দরে ছাওয়া পরিবেশ তাঁকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করে রেখেছিল। শৈশবে গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বাঘিয়া নদী (লোকমুখে যা বাঘিয়ার বলে খ্যাত), বনবনানি আর চোখ জুড়ানো অপরিসীম সৌন্দর্য দেখে তাঁর মধ্যে অন্য এক ধরনের প্রকৃতিপ্রেম তৈরি করে দিয়েছিল, যে প্রেম তিনি তাঁর সারাটা জীবন বয়ে বেড়িয়েছেন- এখানেই তাঁর সার্থকতা।

এতক্ষণ যে মানুষটির কথা বললাম তাঁকে এক নামে চেনে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঙালি, বাংলা ভাষাভাষী। তিনি আমাদের সবার প্রিয় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জের ছায়া সুশীতল টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মেছিলেন তিনি। বাবা-মা ভালোবেসে তাঁর নাম রেখেছিলেন খোকা। সেই খোকা কালক্রমে নিজের যোগ্যতায়, মেধায়, গুণে টুঙ্গিপাড়া থেকে পত্রপল্লবিত হতে হতে বিশ্বসভায়

বঙ্গবন্ধুর বাল্যকালের খেলার মাঠ

আলো ছড়িয়েছেন। বাংলা আর লাল-সবুজের পতাকাকে সম্মানিত করেছেন। আলোকিত করেছেন। আজ শেখ মুজিবুর রহমান মানে শোষিত মানুষের পক্ষে লড়ে যাবার প্রেরণা। নিপীড়িত মানুষের অধিকার আর দাবি আদায়ের পক্ষে লড়াকু নায়ক। অন্যায়- অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের নাম শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু তখন কারাগারে আটক। 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু ১৭ই জুলাই ১৯৬৬ সালের কথা লিখতে গিয়ে লিখেছেন, 'বাদলা ঘাসগুলি আমার দুর্বার বাগানটা নষ্ট করে দিতেছে। কত যে তুলে ফেললাম। তুলেও শেষ করতে পারছি না। আমিও নাছোড়বান্দা। আজ আবার কয়েকজন কয়েদি নিয়ে বাদলা ঘাস ধ্বংসের অভিযান শুরু করলাম। অনেক তুললাম আজ।...আমি কিছু সময় আরও কাজ করলাম ফুলের বাগানে।'

কারাগারের ভেতরে থেকেও দেশের প্রতি, দেশের সবুজ প্রকৃতির প্রতি কতটুকু ভালোবাসা থাকলে একজন মানুষের পক্ষে এভাবে পরিবেশের পরিচর্যার চিন্তাভাবনা আসে! এখানেই তিনি বঙ্গবন্ধু। এখানেই তিনি আমাদের জাতির পিতা। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি।

গাছপালার প্রতি তাঁর অফুরান ভালোবাসার কথা কে না জানে! ১৯৭২ সালে স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা ঘোড়দৌড় বন্ধ করে সেখানে প্রচুর বৃক্ষরোপণ করে দিয়ে ময়দানের নাম বদলে করলেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। মূলত একটি সদ্য স্বাধীন দেশে তিনি এই কাজের মধ্য দিয়ে একটি অসাধ্য সাধন করে দেশবাসীর কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দিলেন যে– বৃক্ষরোপণ করুন, দেশকে বাঁচান। সেদিনের তাঁর সেই বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলার মানুষের কাছে একটি পরিষ্কার বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন, তোমরা এই দেশের মতো সবুজ প্রকৃতিকেও ভালোবাসবে আর তাহলেই দেখবে একদিন প্রকৃতিও তোমাদের বিপদে- আপদে তোমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নারিকেল গাছের চারা রোপণ করছেন বঙ্গবন্ধু
১৬ই জুলাই, ১৯৭২

আমাদের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে ১৮ (ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র বর্তমান ভবিষ্যত নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন'- এটাও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সন্নিবেশিত হয়েছে।

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র পাতায় পাতায়, ছত্রে ছত্রে উঠে এসেছে বাংলা আর বাঙালির প্রতি তাঁর অফুরান ভালোবাসার কথা। তিনি সেই বইয়ের ১৭১ পৃষ্ঠায় গাছের প্রতি, ফুলের প্রতি তাঁর প্রেমের কথা লিখতে গিয়ে লিখেছেন, 'আমি একটা ফুলের বাগান শুরু করেছিলাম। এখানে কোনো ফুলের বাগান ছিল না। জমাদার সিপাহীদের আমি ওয়ার্ড থেকে ফুলের গাছ আনতাম। আমার বাগানটা খুব সুন্দর হয়েছিল।'

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পিতার দেখানো পথে হাঁটছে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে এ দেশের কোমলমতি শিশু-কিশোররা শিখেছে কী করে সবুজ প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হয়। পরিবেশকে ভালোবাসতে হয় আর কীভাবে তাদেরকে সঠিকভাবে পরিচর্যা করে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। বঙ্গবন্ধুর শিখিয়ে দেওয়া পথে এ দেশের আগামি দিনের লক্ষ-কোটি শিশুরাও হাঁটবে। ■

সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

গল্প

সমাজ পাঠে বঙ্গবন্ধু

প্রণব মজুমদার

সাতই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। সাতই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান... এ্যা... এ্যা সাতই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর ডাকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে দেশে একাত্তর সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়। এ্যা... এ্যা... তাঁর ডাকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে দেশে একাত্তর সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়! এ্যা এ্যা...

বাঘা সমাজ পাঠ পড়া মুখস্থ করছিল। প্রতিদিন সকালের মতো ভাইবোনদের সঙ্গে পড়তে বসেছে সেও। গৃহশিক্ষক বিমলেন্দু ঘোষ সমাজ পাঠ বিষয়ের তিন অধ্যায় বাড়ির পড়া দিয়ে গেছেন। পরীক্ষা নিবেন। মাস্টারমশাই বলেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ অধ্যায়টি বেশি করে মুখস্থ করতে। তাই বাঘা এ অধ্যায়টি ২ দিন ধরে পড়ছে।

বাঘা বেশ চঞ্চল স্বভাবের। তবে পড়াশোনায় বেশ ভালো। ভারি দুষ্টু সে। সাত ভাইবোনের মধ্যে মাস্টারমশাইও কড়া নজরে রাখেন তাকে। সপ্তাহে ৬ দিন আসেন তিনি। তিনদিন ছুটিতে থেকেছেন গৃহশিক্ষক। আজ দেরি করে আসবেন বলেছেন। বড়ো এক চৌকিতে শীতলপাটিতে সবাই গোল হয়ে

বসেছে। ছোটো ছোটো পিতলের বাটিতে মা সবাইকে মুড়ি দিয়ে গেছেন। তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া বাঘার জানার কৌতূহলটা একটু বেশিই। মাথায় কোনো খটকা লাগলে বাসায় বাবা, মা ও মেজদিকে বিরক্ত করে ছাড়ে! বাটি থেকে মুখে গুড়-মুড়ি রাখতে রাখতে গিয়ে বলে-

-আচ্ছা মেজদি, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে অইছিল ক্যান? ধর্মে পড়েছি অমৃত নিয়ে অসুরদের বিরুদ্ধে দেবতারা যুদ্ধ করেছিল। অসুররা কুপোকাত হয়! স্বাধীনতা যুদ্ধে কারা অসুর আর কারাইবা দেবতা ছিল? যুদ্ধ জিনিসটাই খারাপ। মানুষ মরে। শোক হয়।

-বেশি কতা কস! বাবাকে গিয়ে বল। আমার সরল অঙ্ক গরল হয়ে যাইব! অনেক অঙ্ক! না পারলে মাস্টারমশাইয়ের বেতের বাড়ি!

-আরে ছোট্ট একটা প্রশ্ন! কস না মেজদি।

-আহ হা! জ্বালাইয়া মারস। যা ত!

-ধ্যাত!

সেজদির কাছেও যায় বাঘা! কিন্তু প্রশ্নের উত্তর মেলে না তার।

মাথায় কত প্রশ্ন আসে দিচ্ছে না কেউ জবাব তার? সুকুমার রায়ের বিষম চিন্তা ছড়াটি কৌতূহলী বাঘার বাংলা বইয়ে পাঠ্য আছে। ছড়াটি মুখস্থ তার। আওড়ালো সে তা কয়েকবার। তারপর আবার সমাজ বইয়ের পাঠে চোখ ফেরায় সে।

-পূর্ব বাংলার জনগণ শোষিত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের অপশাসন বাঙালি নেতা বঙ্গবন্ধু পছন্দ করতেন না। এ্যা... এ্যা পূর্ব বাংলার জনগণ শোষিত ছিল। বাহাত্তর সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়! এ্যা... এ্যা পূর্ব বাংলার জনগণ শোষিত ছিল না!

-এই কী পড়চ? ভুলভাল পড়িস ক্যান?

চৌকির এক কোণে বসে চিকিৎসক বাবা বাজারের হিসাব করছিলেন। বাঘার পাঠে ভুল তথ্য শুনে চেঁচিয়ে উঠেন তিনি।

-এদিকে আয়? কই পাইছস এই কথা?

হতচকিত বাঘা বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বাবা বাঘাকে মুক্তিযুদ্ধের সত্যি ঘটনাগুলো শোনায়। গল্পে গল্পে বাঘার পড়া অনেকটা মুখস্থ হয়ে যায়।

-একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল আমরা পরাধীন ছিলাম বলে। তোর দাদারাও সে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। আমাদের না বলে এজন্য প্রশিক্ষণ নিতে ওরা কলকাতায় যায়। তিন মাস চাঁদপুর থেকে ওরা হাওয়া হয়ে যায়! মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি ছাড়া তোরা সবাই গ্রামের বাড়ি কাশিমপুর ছিলি।

-হ মনে পরচে। আমি ছিলাম আমাগো মজুমদার বাড়ির টি বয়! মুক্তিযুদ্দাগরে চা খাওয়াইতাম!

-আরে কতা শোন! তুই বলছিলি যুদ্ধে কারা অসুর ছিল? পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক, জনগণ ও তার দোসররা অসুর ছিল আর দেবতা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। যুদ্ধে আমাদের তিরিশ লাখ মানুষ পাকিস্তানের সৈন্যদের হাতে শহিদ হন। নির্যাতিত হন অনেক মা-বোনও। পাকিস্তানের দোসর এখানকার কিছু চাটুকার রাজাকার, আল বদর ও আল শামস বাহিনীর সদস্য হয়। সবচেয়ে ক্ষতি করে এরাই আমাদের। এদের দ্বারাও সংখ্যালঘুদের বাড়ি, দোকান লুটপাট হয়। আমাদের এ বাসাও লুট হয়েছিল। ভারতের আন্তরিক সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

-ওই বঙ্গবন্ধু যে গত বছর আমাগো চাঁনপুর আইচিলো ভাষণ দিতে?

-হ! বঙ্গবন্ধু আবার কয়ডা? ওনাকে দেখতে গিয়াই ত তোর পা ভাঙল!

সবাই উঠে দাঁড়ালো। মাস্টারমশাই এলেন। বিমর্ষ চেহারায় ঘরে ঢুকলেন তিনি। বিষণ্ন মুখ দেখে বাবা তার কারণ জানতে চাইলেন।

-কী হয়েছে বিমল তোমার?

-আপনেগো রেডুতে শুনেন নাই কিছু? খারাপ খবর মেসোমশাই! আজ ভোরে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সবাইকে গুলি করে হত্যা করা অইছে! রেডুতে এখনও বলতাছে। ঢাকায় নাকি আর্মি নামছে!

-কী কও তুমি? এমন দেশপ্রেমিক নেতারে দ্যাশের মানুষ কেউ মারতে পারে? পাকিস্তানিরা মারতে পারে নাই। বাবা হতভম্ব হয়ে পড়েন।

-কার এত সাহস? 'ইট কান্ট বি! ইট কান্ট বি!' বাবা ব্যাটারির পাওয়ার কম রেডিওটা খোলার চেষ্টা করতে থাকেন।

মাস্টারমশাই একজন মুক্তিযোদ্ধা। খবরটি শোনার পর থেকে তার মন খারাপ হয়ে যায়। ঘোষপাড়া থেকে আসতে তার পথ চলছিল না! মাস্টারমশাইয়ের ইচ্ছে হচ্ছিল না পড়াতে আসার। আড়ষ্ট কণ্ঠে বাবা ডাকেন মাকে !

- বাবুলের মা, ও বাবুলের মা এদিকে আইও। মা রান্নাঘর থেকে দৌড়ে আসেন।

এমন দুঃসংবাদ শোনার পর থেকে মাস্টার মহাশয়, বাবা, মার মনঃকষ্টের বেদনায় ঘরের পরিবেশ থমথমে! সবার চোখ-মুখ মলিন। মনে হলো এইমাত্র প্রিয়জনের মৃত্যু সংবাদ এল। ১৫ই আগস্টের সকালটা সবাইকে শোকে আচ্ছন্ন করে ফেলে মুহূর্তেই! সকলের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। মাস্টারমশাই আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে পা বাড়ান।

বাঘার মনে পড়ে যায় বঙ্গবন্ধুর কথা। গত বছর শহরের বিষ্ণুদি হেলিপোর্ট ময়দানে তিনি এসেছিলেন। বিকেলে সেখানে পাড়ার বন্ধুরা মিলে গিয়েছিল সে। বঙ্গবন্ধুকে দেখতে গাছে উঠেছিল বাঘা। মনে আছে একজন ফটোগ্রাফারকে বঙ্গবন্ধু ধমক দিয়েছিলেন! প্রচণ্ড ধমকের শব্দে গাছের ডালে বসে থাকা বাঘাও ভয় পেয়ে যায়। ভারসাম্য না রাখতে পেরে ডাল ভেঙে মাটিতে বাঘা চিৎপটাং! তারপর পা ভেঙে বিছানায় থাকে সে অনেকদিন। বঙ্গবন্ধুকে দেখার সে স্মৃতি ভুলতে পারে না বাঘা। ভাবে বড়ো হয়ে সমাজ পাঠের বঙ্গবন্ধুকে কাছ থেকে আর দেখতে পাবে না সে! ■

কথাসাহিত্যিক, কবি ও সাংবাদিক

সৈয়দ ফারসাদ নেয়ামুল সীন, চতুর্থ শ্রেণি, সানিডেইল স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা

জীবনের হাতছানি

অমিত বড়ুয়া

তুমিই দিয়েছ স্বাধীন পতাকা
তুমিই দিয়েছ দেশ
তোমার জন্য বাঙালি জাতির
গ্লানির হলো শেষ।

বর্বর যত পাকিস্তানির
শত যন্ত্রণা সয়ে
বাংলা দখল বুখিয়া দিয়েছ
অনড় শক্তি হয়ে।

তোমার হাতের অঙ্গুলি হেলনে
চীন ও পাকিস্তান
বিশ্ব মোড়ল আমেরিকাটাও
দিয়েছিল পিছুটান।

তোমার বজ্র হুংকার শুনে
কথিত কত না বীর
ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে গিয়েছে
ছেড়ে বাংলার নীড়।

তুমিই শ্রেষ্ঠ তুমিই মহান
বন্ধু এ বাংলার
রূপকার তুমি লাল-সবুজের
গর্বিত পতাকার।

মৃত্যুতে তাই শেষ হয়নি কো
তোমার জীবনখানি
পাঁচটি দশক পরেও দেখছি
জীবনের হাতছানি।

পনেরোই আগস্ট

সৈয়দা নাজমুন নাহার

এই শ্রাবণে কিংবা ভরা ভাদরে তুমি চলে গেলে।
পিতা তোমার শোকে না-কি আমাদের অমোঘ
নিয়তির কথা ভেবে নীরবে কেঁদেছে প্রকৃতি ও মানুষ।
প্রতিশোধের জিঘাংসার বলি মেহেদি রাঙানো
নবদম্পতি; অসহায় বৃদ্ধ ও শিশু;
ঘাতকের বুলেট কেড়ে নিয়েছে মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণ।
যারা আগুন পাখি হয়ে বার বার ফিরে এসেছে,
তোমার স্বাধীন দেশে যখনি শকুন মেলেছে ডানা।
কখনো শহিদ নূর হোসেন কিংবা শহিদ ডাক্তার মিলন
পরাজিত শক্তির দহনে জ্বলেছে, নতুন শতাব্দীর
আগুন পাখিরা, অভিজিৎ, দীপন, শোভন, শান্ত,
ত্বকি, মিরাজ আরো অনেকে।
আজও তোমার বীর সন্তানেরা জেগে আছে পিতা।
ধর্মান্ধতা উগ্র সাম্রাজ্যবাদকে তুমি প্রশ্রয় দাওনি।
যে মাটি বা প্রোটোপ্লাজম থেকে উঠে এসেছিলাম
তারই কসম! আমরা অতন্দ্র প্রহরী, তোমার তাজা খুনে
রাঙানো এই স্বাধীন পূণ্যভূমিতে সোনালি স্বপ্নের বীজ
বুনে চলেছে তোমার রাজকন্যা শেখ হাসিনা।

তুমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

পনেরো আগস্ট শোকের দিন

সালাম হাসেমী

পনেরো আগস্ট শোকের দিবস বাংলাদেশের বুকে,
সব বাঙালি কাঁদছে কেবল বুকের গভীর দুখে।

জাতির পিতার পরিবারসহ সেদিন গভীর রাতে,
হত্যা করেছে হায়েনার দল তাদেরই নিজ হাতে।

বনের পাখিরা বিষাদ কণ্ঠে গাইতে পারে না গান,
কখন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে তাদের কণ্ঠের তান ।
চারদিকে আজ শোকের মাতন করছে বিলাপ সবে,
বাতাসে বইছে বিষাদের ঢেউ হাহাকারময় রবে।

শোকেতে শোকেতে মেঘের আড়ালে সূর্য পড়েছে ঢাকা,
দেওয়ালে দেওয়ালে শোকের পোস্টার কেবল রয়েছে আঁকা।
এই দিন আসে এই দিন যায় বুকে থাকে চাপা ব্যথা,
এত শোকেরই গভীর ব্যথায় কেউ বলে না কথা।

বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা

ফারুক হাসান

মাতৃভূমির মান বাঁচাতে
সাহস নিয়ে মনে
গিয়েছিল দেশের মানুষ
একাত্তরের রণে।

ভুলব না শেখ মুজিবকে
রক্তে-রাঙা পতাকা আর
উন্নত সেই শিরদের।

শৌর্য বীর্যে উড়ল নিশান
সেই তো সবার জানা,
বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা
তোমার আমার মিতা।

কেমন করে ভুলি

আ.ফ.ম. মোদাচ্ছের আলী

লড়াই লড়াই লড়াই করে
করলেন তিনি জীবন পার
দেশের জন্য লড়াইটা তাঁর
ভাষণ ছিল তীক্ষ্ণধার।
জেল জুলুমের জীবন ছিল
ছিল অনেক কষ্ট
এক জীবনে দেননি তিনি
স্বপ্ন হতে নষ্ট।
কর্মী থেকে নেতা হলেন
হলেন জাতির পিতা,
বিশ্ব সভায় বলেন তিনি
সবাই আমার মিতা।
কেমন করে ভুলিরে ভাই
কেমন করে ভুলি
বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা
নেতৃত্ব যাঁর তুলি।

স্বাধীনতার মহানায়ক

মো. সিরাজুল ইসলাম

বন্ধুরা, বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন দেশ। বাংলাদেশের মানুষ এখন স্বাধীন দেশের নাগরিক। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ পরাধীন ছিল। তার নিজস্ব মানচিত্র ছিল না, পতাকা ছিল না, ছিল না সংবিধান। এগুলো সবই এখন বাংলাদেশের আছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বৈরাচারী পাকিস্তানি সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে বাংলার মুক্তিকামী জনতা যে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলে-সেই প্রতিরোধেই বিজয়ী হয়ে আমরা অর্জন করি বাংলাদেশ।

২৬শে মার্চ, আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। আর স্বাধীনতা অর্জনের চূড়ান্ত অধ্যায় হলো মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ কী? সবুজে ঘেরা সুন্দর দেশটা শত্রুমুক্ত করতে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করতে হয়েছিল তাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক কে? জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজ আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদানের কথাই শোনাবো।

অরণ্য ঘেরা প্রকৃতি আর নদনদী বিধৌত ছোট্ট আমার বাংলাদেশ। উড়ন্ত পাখির চোখে, গ্রাম্য মেয়ের হারিয়ে যাওয়া চুলের ফিতের মতো নদীগুলো বয়ে গেছে তার বুকে। যা আজ দক্ষিণ এশিয়ার সমৃদ্ধ দেশ। অপরূপ সুন্দর এই দেশের মানুষেরা শত শত বছর ধরে বাঙালি নামে পরিচিত। যারা কর্মঠ, স্বাধীনচেতা ও শান্তিপ্রিয়।

বঙ্গোপসাগরের ব-দ্বীপে গড়ে উঠা জনপদটি প্রাগৈতিহাসিককালে কয়েকটি ছোটো ছোটো দ্বীপ নিয়ে গঠিত ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে শাসিত হতো। বঙ্গ, রাঢ়, পুন্ড্র, সমতট, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, বরেন্দ্র এসব নাম ছিল। অস্ট্রেলিয়, দ্রাবিড়, ককেশীয় মঙ্গোলীয় আর্যগোষ্ঠীর সমন্বয়ে বাংলা ভাষা গোষ্ঠী বাঙালিরা এক সংকর জাতি হিসেবে গড়ে উঠেছে। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাংক জনপদগুলোকে একত্রিত করে নাম দিয়েছিলেন গৌড়। আবার বিভক্ত হয়েছিল পুন্ড্র, গৌড় ও বঙ্গ নামে। সম্রাট আকবরের সময়ে পুরো বঙ্গদেশ পরিচিত হয়েছিল 'সুবাহ ই বঙ্গালাহ' নামে।

সনাতনী, বৌদ্ধ, মুসলমান ধর্মগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল সব সময়। ইবনে বতুতা, হিউয়েন সাং বাংলাদেশের রূপে মুগ্ধ হয়েছেন। ব-দ্বীপ থেকে বঙ্গ এবং সে বঙ্গ থেকে অনেক পথ পরিক্রমায় পেয়েছি আমাদের আজকের বাংলাদেশ। বাংলা বরাবরই শস্য-সম্পদে, ঐশ্বর্যে ভরপুর ছিল। এজন্যই অনেক বাণিজ্যিক গোষ্ঠী, শাসকগোষ্ঠী এদেশকে শাসন করেছে। শোষণ করেছে।

পাল আমল, সেন বংশ, তুর্কী সুলতানী শাসন, মোগল আমল এ রকম অনেক শাসকগোষ্ঠী বাংলায় রাজত্ব করেছে। পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, কান্তজীর মন্দির, খানজাহানের ষাট গম্বুজ মসজিদ পুরনো বাংলার ঐতিহ্য। এমনই ছিল যুগে যুগে আমাদের এই প্রিয় স্বদেশ।

দিল্লি থেকে মুঘল সম্রাটরা পুরো ভারত ভূখণ্ডকে শাসন করতেন। তাঁরা বাংলা এবং অন্যান্য এলাকাগুলোতে স্থানীয় শাসক নিয়োগ করতেন। স্থানীয় শাসকরা দিল্লির সম্রাটকে কর দিতেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব নিয়োজিত ঢাকা কেন্দ্রিক বাংলার শাসনকর্তা মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭১৩ খ্রিষ্টাব্দে নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। দিল্লিকে আর কর দিতেন না। ঢাকা থেকে সরিয়ে রাজধানী করলেন মুর্শিদাবাদে। ১৭১৪ থেকে ১৭১৭ সালের মধ্যে বাংলার সাথে বিহার এবং উড়িষ্যাকেও জুড়ে নিয়ে নাম রাখেন সুবে বাংলা। তবে বাংলার এসব নবাবরা দিল্লির অধীনতামুক্ত হতে পারেননি। মুর্শিদকুলি খাঁর পথ ধরে মুর্শিদাবাদের নবাব হন আলিবর্দী খাঁ এবং তারপর নবাব সিরাজউদ্দৌলা।

এদিকে বাণিজ্য করতে আসা ইংরেজরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তারা কলকাতার উপকণ্ঠে তাদের বাণিজ্য কুঠিকে স্বাধীন সার্বভৌম এলাকা হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। বাংলার আষাঢ় মাস। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন। ভাগীরথীর তীরে, পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করে নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করে। মাত্র কয়েকজন সৈন্য যুদ্ধের মহড়া দেয়, অধিকাংশ সৈন্য নিষ্ক্রিয় থাকে। ইংরেজরা সহজে জিতে যায় নবাবকে পরাজিত করে। মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রিক বাংলার নবাবী কেড়ে নেয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। পরে ব্রিটিশ সরকার। আরো পরে গোটা ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সরকার দখল করে। ব্রিটিশ শাসিত বাংলাকে জাতিভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা সেখান থেকেই।

স্বাধীনতার লড়াইয়ে তিতুমীর বাঁশের কেল্লার যুদ্ধ করে শহিদ হয়েছেন। কৃষক বিদ্রোহ, ফকির সন্ন্যাসী, শরীয়তুল্লাহর আন্দোলন হয়েছে।

ইংরেজ সরকার ১৯০৫ সালে ঢাকাকে রাজধানী করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিল। ১৯৪৭ সালে যুক্ত পাকিস্তানে বাঙালিরা স্বদেশে পরবাসী ছিল। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় প্রাণ দিয়ে বাঙালি এক হয়েছে। ভাষা সংস্কৃতি শোষণের প্রতিবাদে সাংস্কৃতিক চেতনায় স্বাধিকারের পথে এগিয়েছে। জেগে উঠেছে প্রতিবাদী বাঙালি। নেতৃত্বে এসেছেন মুক্তির মহানায়ক, জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান।

শতাব্দীর মহানায়ক, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি তিনি। যিনি ধাপে ধাপে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নেতৃত্বের শীর্ষ আসনে চলে আসেন। বাঙালি জাতিকে আলোর পথ দেখান। একতাবদ্ধ করেছিলেন, গড়েছিলেন প্রতিবাদী জাতি হিসেবে। মুক্তির মহামন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন। জাতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যে। তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের সোনার ফসল এই স্বাধীন বাংলাদেশ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অসামান্য অবদানের জন্য অধিষ্ঠিত হয়েছেন বাঙালির

জাতির পিতার আসনে।

বঙ্গবন্ধু ছাত্রজীবন থেকেই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসন-শোষণ, অত্যাচার, নিপীড়ন ও বঞ্চনার বিপক্ষে প্রতিবাদমুখর।

বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ভূখণ্ডের স্বপ্ন এদেশের মানুষ দীর্ঘদিন থেকে লালন করে আসছিল। তবে সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন হয়েছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই। প্রতিবাদী এ প্রাণপুরুষ প্রতিটি আন্দোলনে ছিলেন সবার আগে। পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা সব সময় বঙ্গবন্ধুর ভয়ে তটস্থ থাকত। তারা বিভিন্ন অজুহাতে বঙ্গবন্ধুকে জেলে বন্দি রেখেই স্বস্তি পেত। দীর্ঘ ১২ বছরেরও বেশি সময় তিনি কারাগারে থেকেছেন। অসংখ্য মিথ্যা মামলায় বার বার বন্দি হয়েও এ দেশের স্বাধিকার আন্দোলনে প্রেরণা দিয়েছিলেন। একটি জাতির স্বপ্নকে তিনি ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে দিয়েছেন, জাতিকে প্রস্তুত করে দিয়েছেন।

জেলে থাকা অবস্থায়ই তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ১৯৬৬ সালে ৬-দফা কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেন। এই ৬-দফা ছিল বাঙালির মুক্তিসনদ।

বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা আন্দোলন ঠেকাতে পাকিস্তানি সামরিক শাসক আইয়ুব খান 'ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়' শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি করে প্রহসনের বিচার শুরু করে। এদেশের মানুষের গণদাবির মুখে উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁকে মুক্ত করার পর শুরু হয় তীব্র আন্দোলন। ১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি বাংলার মানুষের ভালোবাসায় তিনি 'বঙ্গবন্ধু' নামে ভূষিত হন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় বঙ্গবন্ধু গোটা জাতিকে স্বাধিকারের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করে তোলেন। পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ হিসেবে উল্লেখ করতে লাগলেন। এই নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পর তিনি বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে পরিগণিত হন। অথচ তাঁকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দেয়নি পাকিস্তানিরা। ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের হাতে ধরে রাখে। আইন পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ পল্টনের জনসভায় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে তাঁকে জাতির পিতা বলে আখ্যায়িত করা হয়। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রমনায় অবস্থিত রেসকোর্স ময়দানে, বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায়, বাঙালিদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। ১৮ মিনিটের তেজস্বী ভাষণে তিনি তখনকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাক দেন।

বঙ্গবন্ধু সাড়ে সাত কোটি মানুষের নেতা, নির্বাচনের মাধ্যমে সাংবিধানিকভাবে তিনিই বৈধ নেতা। মনে রাখতে হবে, এটি নির্বাচিত বৈধ এবং সর্বজনের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নেতার ঘোষণা। জনগণ বস্তুতপক্ষে সেদিনই স্বাধীনতার বারতা পেয়েছে।

৭ই মার্চ তারিখের পড়ন্ত বিকেলে রেসকোর্স ময়দানের মঞ্চ থেকে বঙ্গবন্ধু ডাক দিয়েছিলেন স্বাধীনতার, মুক্তির। ৭ই মার্চের ভাষণে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। সেদিনই স্বাধীনতার ঘোষণা পেয়ে গেছে তাঁর জনগণ। তাই তো তারা দখলদারদের হটাতে যুদ্ধে নেমেছিল। এই ভাষণ, এই ডাক অন্তরে ধারণ করেই তারা নয় মাস ত্যাগ ও বীরত্বের সঙ্গে নেতার নির্দেশ মেনে মুক্তির যুদ্ধ করেছিল, এনেছিল বিজয় ছিনিয়ে। বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন:

'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশা আল্লাহ।...এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল একজন দক্ষ কৌশলীর সুনিপুণ বক্তব্য। বিশেষত ভাষণের শেষ পর্যায়ে তিনি 'স্বাধীনতার' কথা এমনভাবে উচ্চারণ করেন, যাতে ঘোষণার কিছু বাকিও থাকল না, আবার তাঁর বিরুদ্ধে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার অভিযোগ উত্থাপন করাও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর জন্য সম্ভব ছিল না। বস্তুত বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতারই ঘোষণা। ৯ মাসব্যাপী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বঙ্গবন্ধুর এ কৌশল বা অবস্থান বাংলাদেশ সংগ্রামের পক্ষে ইতিবাচক ফল বয়ে আনে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে রাতারাতি সশস্ত্র করে তোলে। একটি ভাষণকে অবলম্বন করে স্বাধীনতার জন্য ৩০ লাখ বাঙালি জীবন উৎসর্গ ও কয়েক লাখ মা-বোন সম্ভ্রম বিসর্জন দেন। ৭১'এর মুক্তিযুদ্ধকালে এ ভাষণ (বজ্রকণ্ঠ) রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অনুপ্রাণিত করে। বলা যায়, এই একটি ভাষণ একটি জাতিরাষ্ট্র, বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছে, যা বিশ্বে নজিরবিহীন। জাতিসংঘ সংস্থা ইউনেসকো এ ভাষণকে ৩০শে অক্টোবর ২০১৭ বিশ্ব-ঐতিহ্য সম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে 'দ্য ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব ওয়ার্ল্ড' রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

দশ লক্ষাধিক জনতার উপস্থিতিতে ৭ই মার্চের সেই বুদ্ধিদীপ্ত ভাষণ পুরো পৃথিবীকে জানিয়ে দিয়েছিল, বাঙালি জাতি মুক্তির জন্য কতটা উন্মুখ হয়ে উঠেছে। ভাষণের প্রত্যেক পর্যায়ে এবং ধাপে ধাপে তিনি অসহযোগ আন্দোলন ও হরতাল কর্মসূচি পালনের নির্দেশনা দেন। একটি গেরিলা যুদ্ধের দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। ভাষণ শেষে স্বাধীনতার পক্ষে স্লোগানমুখর হয়ে উঠেছিল ঢাকার রাস্তাগুলো। তাঁর আহ্বানে শুরু হলো মুক্তির লড়াই। সর্বস্তরের জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে ।

স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরুর দিনগুলোতে তাঁর নির্দেশেই পূর্ব পাকিস্তান পরিচালিত হতো। তিনি পরিণত হয়েছিলেন বাংলার সব বর্ণের, সব ধর্মের, সব মানুষের এক অবিসংবাদিত নেতায়। তাঁর কথায় বাঙালি উঠত-বসত। তাঁর অঙ্গুলি হেলনে সারা দেশ থমকে যেত। বঙ্গবন্ধুর বজ্রকঠিন ভাষণের প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে বাঙালি জাতি পালন করেছিল।

১৯৭১ সালের মার্চে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় প্রতিদিনই ঘটতে থাকে অভাবনীয় ঘটনা। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী বাঙালি জাতিকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্য উন্মত্ত হয়ে ওঠে। ২৫শে মার্চ কালরাতে অপারেশন সার্চলাইটের নামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। অপ্রত্যাশিত সেই দম আটকানো পরিস্থিতিতে বাঙালি

মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকে। মুক্তির লক্ষ্যে তারাও সংগঠিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন।

স্বাধীনতা ঘোষণার কিছুক্ষণ পরেই পাকসেনারা তাঁকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায়। এরপর তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানের মিলানওয়ালী কারাগারে স্থানান্তর করে দীর্ঘ দশ মাস বন্দি করে রাখে। রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় ক্যারিশমেটিক লিডার বঙ্গবন্ধু ছিলেন অনন্য। যুদ্ধের জন্য বঙ্গবন্ধু যে প্লাটফর্ম তৈরি করেছিলেন তার উপর ভিত্তি করেই মহান মুক্তিসংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল। তাঁর নির্দেশ মোতাবেক মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। মুজিবনগর সরকারের (অনুপস্থিত) রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর দেওয়া স্বাধীনতার ঘোষণাকে ১০ই এপ্রিল গণপরিষদ আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দিয়েছিল। ১৭ই এপ্রিল শপথের দিনে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে পাকিস্তানি শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামের যে পথচলা শুরু হয়, ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিলে মুজিবনগর সরকার গঠনের মাধ্যমে তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

কাকতালীয় ব্যাপার হলো, ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর আমবাগানে বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। সেই পলাশির আমবাগানের মাত্র ২৩ মাইল দূরে ২১৪ বছর পর, ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার, ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলার আরেক আমবাগানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীনতার অস্তমিত সূর্য আবার উদিত হয়।

সেখানে Declaration of Independence (স্বাধীনতার মূল ঘোষণা আদেশ)-এ সরকারের অধ্যাদেশে ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করা হয়।

দেশের পাশাপাশি বহির্বিশ্বেও স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধু বহু নেতৃত্ব তৈরি করেছিলেন। এতে স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে উঠেছিল।

পাকিস্তানি কুচক্রী সরকার স্বাধীনতা ঘোষণার অপরাধে বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহীতার অপরাধে ফাঁসির

আদেশ দেয়। কিন্তু বিশ্ব নেতৃবৃন্দের চাপ বার বার তাঁকে ফাঁসির দড়ি থেকে ফিরিয়ে এনেছে।

১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হলো কাঙ্ক্ষিত বিজয়। ৫৬ হাজার বর্গমাইলের এদেশটিকে বঙ্গবন্ধু আমাদের করে, স্বাধীন আবাসভূমি করে ফিরিয়ে এনেছিলেন। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং বিচক্ষণ নেতৃত্বের কারণেই মাত্র ৯ মাসে স্বাধীনতার লালিত স্বপ্নকে ছিনিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি যখন তিনি দেশে ফিরেছিলেন এ দেশের মানুষ আবেগে উচ্ছ্বাসে বরণ করেছিল এ বিশ্ববরেণ্য নেতাকে।

খেয়াল করো, একটি দেশ গড়ে তোলার জন্য ১৯৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু দেশটির নাম রাখেন বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারি দেশটির আইন পরিষদের সদস্যগণ ৬-দফা বাস্তবায়নের শপথ নেবার সময় উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি– যে গান পরবর্তীতে হয়েছে আমাদের দেশের জাতীয় সঙ্গীত।

১৯৭১ সালের ২৩শে মার্চ নিজ বাসভবনে উড়িয়েছিলেন স্বাধীন বাংলার মানচিত্র খচিত লাল-সবুজ পতাকা। এই স্বপ্নের পথ ধরেই তো পেয়েছি আমাদের প্রিয় স্বদেশ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমাদের স্বাধীনতার মূল স্থপতি। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান সারথি ও অগ্নিপুরুষ। মুক্তিযুদ্ধকালীন একাত্তরের নয় মাস তিনি সশরীরে আমাদের মাঝে ছিলেন না– এটা ঠিক। তবে রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধারা এবং অবরুদ্ধ বাংলাদেশের মুক্তিকামী বাঙালি জনগণ ঐ নয় মাস তাঁর দৃপ্ত মুখমণ্ডলকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। তাঁর স্লোগান 'জয়বাংলা'কে কণ্ঠে ধারণ করে স্বদেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রাণপণ লড়েছে। তাঁর অনুপস্থিতিতেও তাঁকে বসিয়েছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির আসনে।

বিবিসির জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি তিনি। তিনি আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক। মুক্তির দিশারি। তিনিই ছিলেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান কাণ্ডারি। বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু তাই একাকার হয়ে মিশে আছে। বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ এবং আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতা তাই একই সূত্রে গাঁথা। ৩০ লক্ষ লোক অকাতরে প্রাণ দিয়েছে স্বাধীনতার জন্য তাঁরই উদাত্ত আহ্বানে।

বন্ধুরা জানলে তো, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর কী অপরিসীম ভূমিকা ছিল। তাঁর ডাকেই তো আমরা পেয়েছি লাল-সবুজ পতাকার স্বাধীন বাংলাদেশ।■

সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সরকারি বিএল কলেজ, খুলনা

তথ্যসূত্র :

হাসান হাফিজুর রহমান, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র, ঢাকা, ১৯৮২;
এইচ.টি.ইমাম, বাংলাদেশ সরকার-১৯৭১, ২০০৪;
নূরুল কাদের, একাত্তর আমার, ১৯৯৯;
শামসুল হুদা চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর, ১৯৮৫;
মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ঢাকা, ২০০৮।
আকবর আলি খান, মুজিবনগর সরকারের শেষের কয়েকটি দিন,
কবীর চৌধুরী, কেন তিনি জাতির পিতা, সচিত্র বাংলাদেশ, ডিএফপি, ঢাকা, জুলাই-আগস্ট ২০১১, পৃ:২৮-৩০
মোয়াজ্জেম হোসেন খোকন, মুক্তিযুদ্ধ ও আমাদের গৌরবময় স্বাধীনতা, সচিত্র বাংলাদেশ, ডিএফপি, ঢাকা, মার্চ-২০১২, পৃ:১৮-২২
মো: সিরাজুল ইসলাম, স্বাধীনতার পটভূমি একুশ,সচিত্র বাংলাদেশ, ডিএফপি, ঢাকা, মার্চ-২০১২, পৃ:২৩
ড. মোহাম্মদ হানান কেন তিনি শ্রেষ্ঠ বাঙালি, নবারুণ, ডিএফপি, ঢাকা, মার্চ-২০২০, পৃ:০৯-১৭
আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন, মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিবনগর সরকার, যুগান্তর, ১৭ই এপ্রিল ২০২২
মোনায়েম সরকার : মুজিবনগর সরকার : কাছ থেকে দেখা ১০ই এপ্রিল ২০২২
মো. সিরাজুল ইসলাম, ১৭ই এপ্রিল : মুজিবনগর দিবস ও মুজিবনগর সরকার, নবারুণ, এপ্রিল ২০২১

বঙ্গমাতার জন্মদিন উপলক্ষ্যে

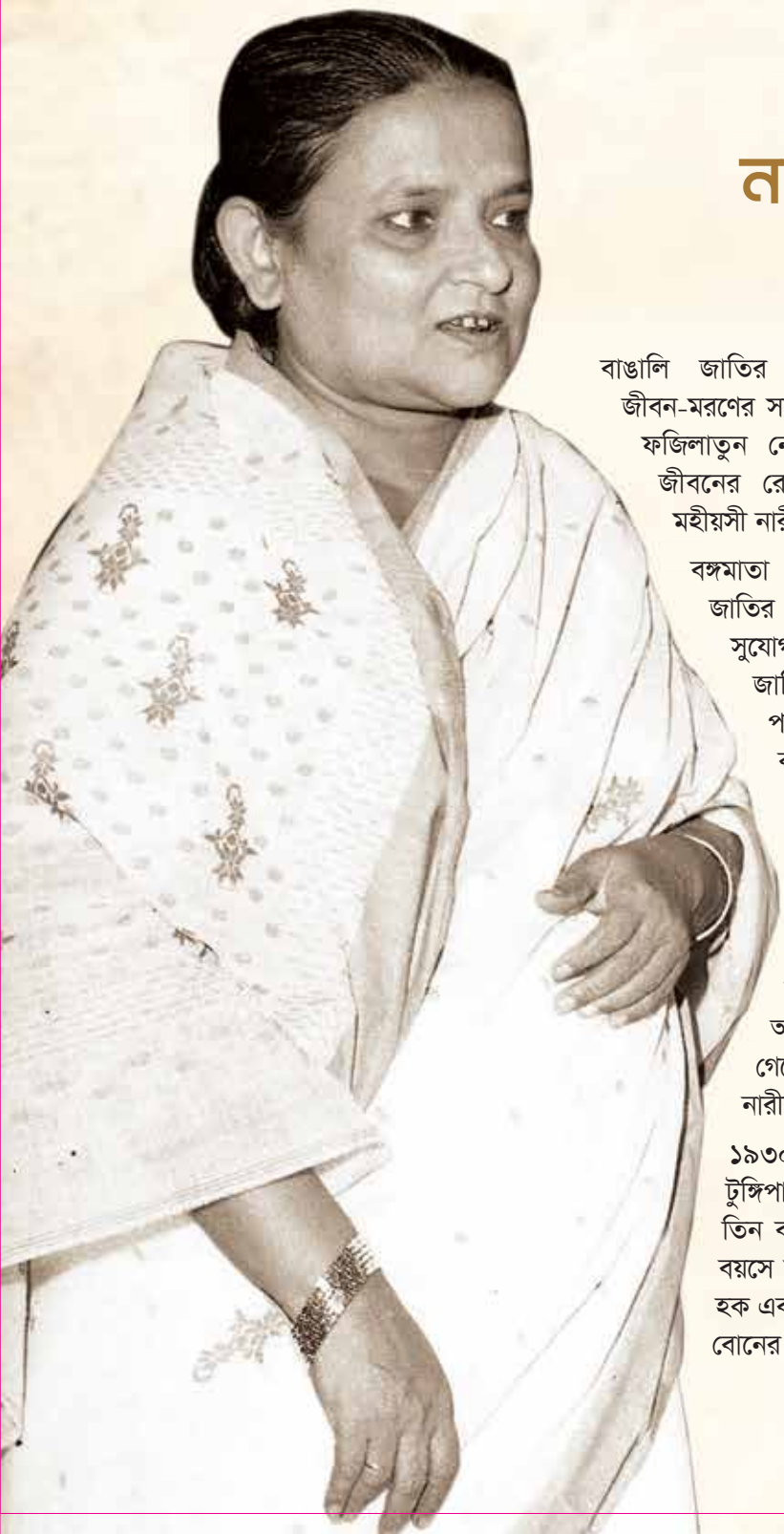

মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা

হাছিনা আক্তার

বাঙালি জাতির যুগসন্ধিক্ষণের মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর জীবন-মরণের সঙ্গী ছিলেন মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর জীবনের রেণু। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক মহীয়সী নারী।

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য সহধর্মিণী ও সহযোদ্ধা। তিনি বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপে বঙ্গবন্ধুকে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন ও প্রেরণা যুগিয়েছেন। এই মহীয়সী নারী নিজেকে শুধু স্বামী, সন্তান, সংসার ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সর্বক্ষণের সহযোগী ও অনুপ্রেরণাদায়ী হয়ে নিভৃতে কাজ করে গেছেন। মহান স্বাধীনতা অর্জনে এ মহীয়সী নারীর রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা।

১৯৩০ সালের ৮ই আগস্ট গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেণ রেণু। মাত্র তিন বছর বয়সে তিনি পিতাকে ও পাঁচ বছর বয়সে মাকে হারান। পিতার নাম শেখ জহুরুল হক এবং মাতার নাম হোসনে আরা বেগম। দুই বোনের মধ্যে রেণু ছিলেন ছোটো। চাচা শেখ

লুৎফর রহমানের পুত্র শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ১৯৩৮ সালে খুব অল্প বয়সে রেণুর বিবাহ হয়। শৈশব থেকেই রেণু শেখ মুজিবের মাতা সায়েরা খাতুনের অন্যান্য সন্তানদের সাথে একসাথে বড়ো হয়েছেন।

জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠার পেছনে মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের অসাধারণ ভূমিকা ছিল। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে পর্দার অন্তরালে থেকে তিনি পরামর্শ, সাহস ও অনুপ্রেরণাসহ সকল কাজে সহযোগিতা দিয়েছেন। বঙ্গমাতার অবদান সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

'রেণু খুব কষ্ট করত, কিন্তু কিছুই বলত না। নিজে কষ্ট করে আমার জন্য টাকা পয়সা জোগাড় করে রাখত, যাতে আমার কষ্ট না হয়।' [সূত্র: শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা নং-১২৬]

বঙ্গবন্ধু জীবনের দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন কারাগারে। তাঁর অবর্তমানে একজন সাধারণ গৃহবধূ হয়েও মামলা পরিচালনা করে দলকে সংগঠিত করতে সহায়তা করা, আন্দোলন পরিচালনায় পরামর্শ দেওয়াসহ প্রতিটি কাজে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে সংসার, সন্তান এবং বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়িকে অবলম্বন করে ওই বিপৎসংকুল দিনগুলো পাড়ি দিয়েছেন হাসিমুখে। স্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সন্তানদের গড়ে তোলেন। তাঁর কাছে সহযোগিতা চেয়ে কেউ কখনো খালি হাতে ফিরে যাননি, সন্তানদের যেমনি ভালোবেসেছেন তেমনি শাসনও করেছেন। বেগম মুজিব ছিলেন কোমলে কঠোরে মিশ্রিত এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাহসী নারী। এই মহীয়সী নারীর স্নেহ, মায়া-মমতা, দরদ ও আপ্যায়নের কথা আজও স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকরা অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

বেগম মুজিব স্বামীর চাইতেও কঠিন ও অনমণীয় ছিলেন। জীবনে অসহ্য দুঃখ ও ক্লেশ সহ্য করেছেন। কিন্তু স্বামীকে প্রলোভনের কাছে মাথা বিক্রি করতে দেননি। ক্ষমতা কিংবা অর্থের মোহে কখনো আপোশ করতে দেননি। বঙ্গবন্ধুর জন্য বঙ্গমাতা ছিলেন শক্তিদায়িনী এবং প্রেরণাদায়িণী। বঙ্গবন্ধুর রেণুকে বাদ দিয়ে বাংলার ইতিহাস কখনো পূর্ণতা পেতে পারে না।

বঙ্গমাতা নিজ জীবনের কঠিন দুঃসময়েও অসহায় মানুষকে আর্থিক সহায়তা করেছেন। বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব সংকটে, সংগ্রামে ও যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে নারী অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ণ, নারী পুনর্বাসন কার্যক্রমে অসামান্য অবদান রেখেছেন।

বঙ্গমাতার অনন্য সাধারণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের নেপথ্যে বঙ্গমাতার সঠিক পরামর্শ ছিল। বঙ্গবন্ধুকে সেই সময় তাঁর সহচররা ৭ই মার্চের ভাষণের ব্যাপারে নানা পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। বঙ্গমাতা এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুকে যা মন থেকে বলতে ইচ্ছে করে, যা বলা উচিত, তা-ই বলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। 'এবারের সংগ্রাম-আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম-স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে বঙ্গবন্ধুর সেদিনের স্বাধীনতার ডাকে বঙ্গমাতা বঙ্গবন্ধুকে মনস্তাত্ত্বিক সাহস জুগিয়েছেন।

আমাদের আরো বেদনাহত হতে হয় যখন ভাবি, সেই শৈশব-কৈশোরের খেলার সঙ্গী থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও ফজিলাতুন নেছা রেণু জীবনেও যেমন দুজনে দুজনার সুখ-দুঃখ আনন্দ- বেদনা ও সংগ্রামের সাথি ছিলেন, তেমনি মরণেও সঙ্গী হয়ে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নেন।

ঘাতকের বুলেটে রক্তাক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আর ফজিলাতুন নেছা রেণু অমর হয়ে থাকবেন বাংলার মাটিতে, জনগণের হৃদয়ে চিরকাল। ■

সিনিয়র সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ

তথ্যসূত্র:

১. মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুন নেছা, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২. অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান

গল্প

পানকৌড়ি

আশরাফ আলী চারু

এখন প্রায় দুপুর। সেই সকাল থেকেই পানকৌড়িটি কলমিলতার ডালে পাখা মেলে বসে আছে। এত লম্বা সময় ধরে কেন এভাবে বসে আছে জানার জন্য এগিয়ে এল মাছরাঙা। বসল পাশের ডালে। পানকৌড়িকে ভালো করে তাকিয়ে দেখল মাছরাঙা। হাড্ডিসার পানকৌড়ির ছাতিতে সামান্য মাংসও নেই। না খেয়ে খেয়ে মনে হয় তার এমন দশা। চোখের দিকে তাকাতেই আরো হতচকিত হয়ে পড়ল

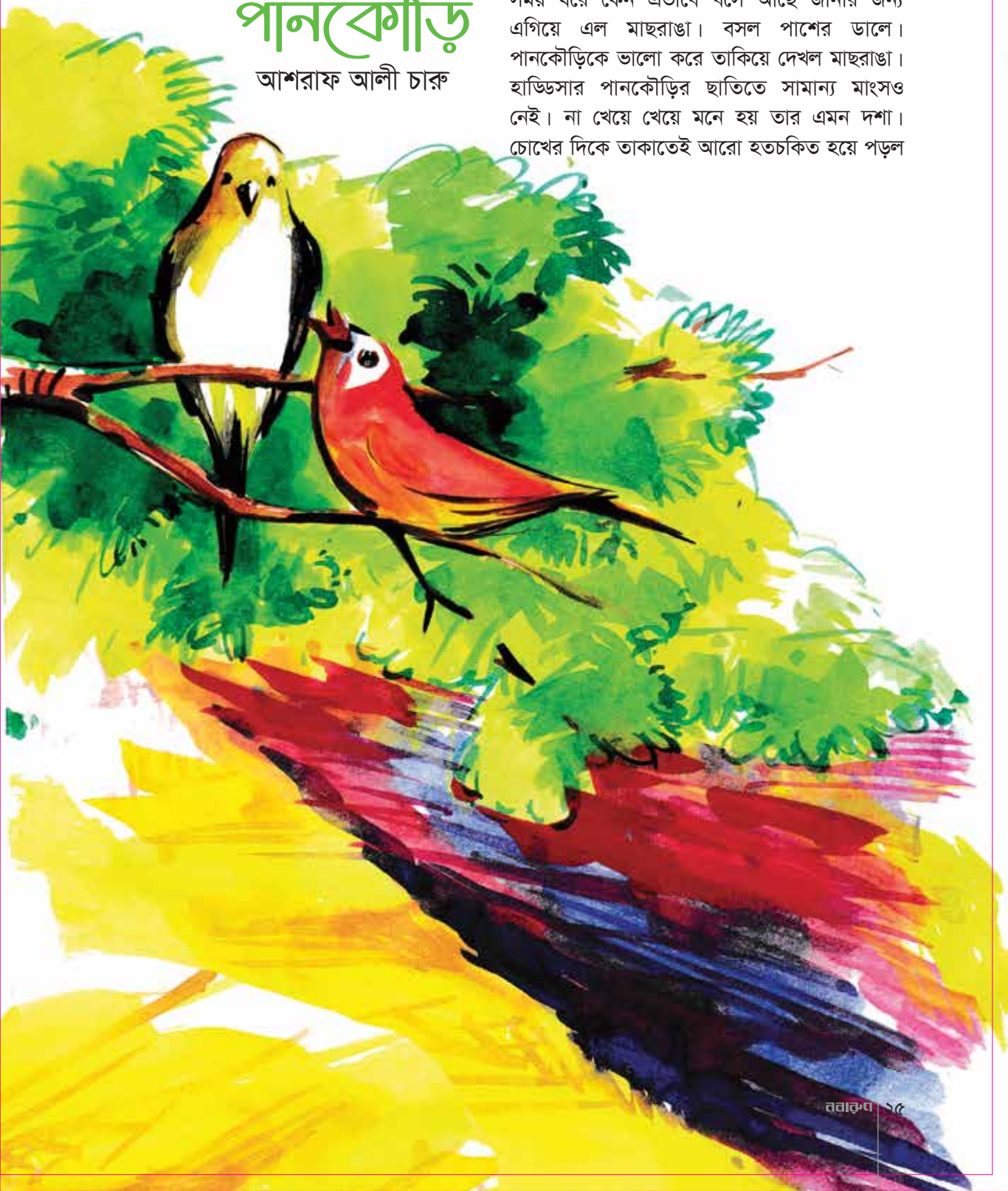

মাছরাঙা। পানকৌড়ির চোখ বেয়ে অঝোরে পানি গড়াচ্ছে। কান্নার কারণ সম্পর্কে জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ল সে। জিজ্ঞেস করল ও ভাই পানকৌড়ি কী হয়েছে তোমার? সেই সকালবেলা হতেই দেখছি কলমিলতা ডালে পাখা মেলে বসে আছো। একটিবারও দেখলাম না পানিতে নামতে। পানিতে না নামলে কোথা হতে খাবার পাবে তুমি? কাছে এসে দেখি অনবরত কাঁদছ! কী সমস্যা তোমার ভাই?

এতগুলো প্রশ্ন শুনে পাখনা গুটিয়ে সুন্দর করে বসে উত্তর দিতে চাইল পানকৌড়ি। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনের দিকে হেলে পড়ল। না খেয়ে খেয়ে দুর্বল শরীরে যা হওয়ার কথা আর কী। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে আবার পাখনা মেলে নিলো সে। বুকটা চিনচিন করে ব্যথা করছে তার। কাঁদতে কাঁদতে চোখ যাওয়ার দশা। গলায় জোর নেই তবু বলল- ভাই, এদেশের জলাশয়গুলোর কোথাও আমি নামতে পারছি না। পানির দিকে তাকালেই দেখতে পাচ্ছি শুধু রক্ত আর রক্ত। আর দেখবই না কেন, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের রক্ত এই পানিতেই মিশে আছে। একাত্তরের স্বাধীনতাকামী শহিদ বিপ্লবীদের রক্ত এ পানিতেই মিশে আছে। পঁচাত্তরের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর পরিবারের রক্ত এই পানিতেই মিশে আছে। এই দেশের একফোঁটা পানিও নেই রক্তের সংমিশ্রণ ছাড়া। আমি যে এদেশের বীর সেনানীদের শ্রদ্ধা করি। আমি যে বঙ্গবন্ধু পরিবারকে শ্রদ্ধা করি। শিশু রাসেলের উপর আমার যে বড্ড মায়া। এই রক্তময় পানিতে নামলে আমার যে বড্ড বেয়াদবি হয়ে যাবে ভাই। তাই কোনো জলাশয়েই আমি নামতে পারছি না। এজন্যই আমাকে ভুলতে হয়েছে সুস্বাদু মাছের স্বাদ। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি না খেয়ে মরব তবু এই রক্তাক্ত পানিতে নামব না কোনোদিন। জানো, চলনবিলে গিয়েছি সেখানেও রক্ত দেখেছি। হাকালুকিতে গিয়েছি সেখানেও। ছোটো, বড়ো নদী-খাল, বিল-ঝিল, ডোবা নালা, পুকুর শেষমেষ বঙ্গোপসাগর কোথাও একফোঁটা পানি পেলাম না রক্তের সংমিশ্রণ ছাড়া। তেরোশো নদীর দেশে- উড়তে উড়তে পাখা আর চলে না। তবু কোথাও পেলাম না একফোঁটা রক্তবিহীন পানি। তাই পানিতে নামাও হয় না, ভালোমতো খাওয়াও হয় না। আর না খেয়ে খেয়ে শরীরেও বল নেই। নিজেকে নিয়ন্ত্রণও করতে পারি না। তাই সারাক্ষণ পাখনা মেলে বসে থাকি। ভালোবাসার কারণে অনবরত অশ্রু ঝরে। অশ্রু ঝরতে ঝরতে এখন আর ভালোমতো চোখেও দেখি না। বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠে পানকৌড়ি। ঈষৎ থামার পর সে বুঝতে পারে এসব শুনে মাছরাঙাও অঝোর ধারায় কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে।

এবার কাঁদতে কাঁদতে মাছরাঙা বলল- তুমি তবে খাও কী?

-আমি ডাঙায় চড়া দুই-একটা ব্যাঙ খেয়ে দিন পার করছি। বিধাতার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি বাকি জীবনে পানিতে নামব না, এভাবেই চলুক জীবন।

-তোমাদের প্রজাতিরা কত রকম মাছ খায়। কত স্বাদ মাছে। অথচ কখনোই মাছের স্বাদ পেলে না তুমি! আমি না হয় তোমাকে মাছ ধরে দিই তুমি এখানে বসে খাও। পানিতে নামতে হবে না।

-না, না কখনোই নয়। রাসেলের রক্তে রঞ্জিত পানির মাছ আমি খাবো না। বঙ্গবন্ধুর রক্তে রঞ্জিত পানিকে আমি সম্মান করি। ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধে শহিদ ওরা আমার ভাই। ওটা আমার দ্বারা হবে না।

-তবে যে ব্যাঙ খাও ওরাও তো পানিতে থাকে- তাই না?

-ব্যাঙ উভচর প্রাণী। তাই ওটা খেয়েই কোনোমতে বেঁচে আছি। তবে সে যদি মাছের মতো শুধু পানিতেই বসবাস করত তবে ব্যাঙও নয় বরং না খেয়ে মরে যেতাম। তবু রক্তগঙ্গার কিছুই মুখে তুলতাম না।

পানকৌড়ির মাতৃভাষা, দেশাত্মবোধ, শহিদ বীর সেনানী, সবিশেষ বঙ্গবন্ধু পরিবার এবং রাসেলের উপর মমত্ববোধ দেখে মাছরাঙা কৃতজ্ঞতা জানালো পানকৌড়িকে। পরের দিনটুকু কৃতজ্ঞতাবোধের দৃষ্টিতে পানকৌড়ির দিকে মাছরাঙা শুধু তাকিয়েই রইল, এবং সে-ও ভুলে গেল তার আহারের কথা।■

সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

রূপনের বঙ্গবন্ধু স্মরণ

কাজী কেয়া

'রূপনের কী হলো?'– মা বেশ চিন্তিত ওর প্রতিদিনের রুটিন-কাজগুলো দেখে। মাঝে মাঝে নতুন নতুন ভাবনা ওর মাথায় ভর করে। 'ও কোত্থেকে এসব কাজের প্রেরণা পায়?'– নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেন মা। কোনো উত্তর মেলে না। তবে, ছোট্ট এই সন্তানটির কাজগুলো তাঁকে বিমোহিত করে। মুগ্ধ হন। বিস্মিতও হন।

হুম, অবাক হওয়ারই কথা। খুব ভোরে ওঠে রূপন। তখন পাখিরাও জাগে না। উঠে পড়তে বসে। পড়তে পড়তে প্রকৃতির আঁধার ভাবটা কেটে ভোরের আলো ফুটিফুটি হয়ে ওঠে। তখন পাখিদের কলতান ভেসে আসে বাগান থেকে। ছোট্ট একটা বাগান। রূপনের বাগান। সে নিজ হাতে লাগিয়েছে চারাগুলো। দুটো লতা আম, চালতা একটা, একটা নেবু, জুঁই, বেলি আর গাঁদাফুলের কিছু চারা। গাছগুলো সে গত বছর বাবার সঙ্গে গিয়ে শেরেবাংলা নগর বৃক্ষমেলা থেকে কিনে এনেছিল । ফল গাছগুলো বেশ ডাঁটো হয়েছে। ফুল ফুটেছে নেবু গাছে। নেবু ফুলের সুগন্ধ রূপনের খুব ভালো লাগে। হ্যাঁ, ভোরের পাখিরা ডেকে উঠলেই রূপন বইগুলো গুছিয়ে রেখে সোজা বাগানে

চলে যায় গাছে পানি ছিটানোর জন্য। পাড়ার ফেরিওয়ালার কাছ থেকে একটা প্লাস্টিকের পাত্র কিনেছে। ওটাকে রূপন নাম দিয়েছে জল ঝাঁঝরি। সে তার ঝাঁঝরিতে পানি ভরে গাছগুলোর গোড়ায় ঢালে। তার আগে নিড়ানি দিয়ে গাছের আশপাশের আগাছা-ঘাসগুলো পরিষ্কার করে।

ভোরে উঠে পড়তে বসা, পড়া শেষে বাগানের যত্ন নেয়া– এরপর হাত-পা ধুয়ে, দাঁত ব্রাশ করে প্রস্তুত হয় স্কুলে যাওয়ার জন্য। ততক্ষণে মা নাশতা বানিয়ে, টেবিলে সাজিয়ে ডাকেন– রূপন বাবু নাশতা রেডি!

রূপন ব্যাগে বইপত্র, পানির পট সব গুছিয়ে, ব্যাগটা পিঠে বেঁধে নাশতার টেবিলে এসে বসে। নাশতা শেষ হতেই স্কুল ভ্যান এসে টুং টুং ঘণ্টা বাজায়। তখন সকাল সাড়ে সাতটা। রূপন দৌড়ে গিয়ে ভ্যান বন্ধুকে শুভ সকাল জানিয়েই ভ্যানে চড়ে বসে। ওহো, স্কুলে যাওয়ার আগে রূপন তার পড়ার ঘরের দেয়ালে টাঙানো বঙ্গবন্ধুর ছবির কাছে গিয়ে কিছু সময় তাকিয়ে থাকে। বঙ্গবন্ধুর ছবির পাশে ক্লাস ফোরে পড়া ছোট্ট শেখ রাসেলের ছবিটার দিকেও ছলছল চোখে তাকায় একটুখানি।

রূপনের স্কুল কাছেই। ঠিক আটটা থেকে ক্লাস শুরু হয় ওদের। স্কুলের নাম– খুদে তারকাদের বিদ্যাপীঠ। স্কুলের নামটা একটু কঠিন মনে হলেও রূপনের ভারি পছন্দের নামটা। রূপন এই স্কুলে ক্লাস ফোরে পড়ে। ক্লাসের ফার্স্ট বয়। স্যাররা ওকে খুব ভালোবাসেন। পড়াশোনায় সেরা বলেই নয়, জ্ঞান-জিজ্ঞাসা আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা– এসব প্রতিযোগিতাতেও রূপন সবসময় প্রথম হয়। আর স্যারদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং সহপাঠীদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহারের জন্যও সে সবার প্রিয়।

তো, রূপন এত ভালো ছেলে কীভাবে হলো? ছোটোবেলায়ও কিন্তু খুব চঞ্চল ছিল। মা অতিষ্ঠ ছিলেন ওর দুষ্টুমিতে। সারা ঘর হৈচৈ-চেঁচামেচিতে মাথায় করে রাখত। অবশ্য, বাবা বলতেন দেখবে একটু বড়ো হলে আমাদের এই রূপন সবচেয়ে ভালো ছেলে হয়ে উঠবে। মা উলটো শুনিয়ে দিতেন, ভোরের মেঘ দেখলেই দিন কেমন যাবে বোঝা যায়। ওই তো আমাদের পল্টু, সে ছোটোবেলায় যেমন ডানপিটে ছিল, এমএ পাস করার পরও তেমনই আছে। মায়ের কথায় বাবা একটু হেসে বলতেন, তোমার ভাই পল্টুও ভালো হবে, তবে আরো বয়স হলে।

রূপনের বাবা সরকারি চাকুরে। সেই ভোরে কাজে বেরিয়ে গিয়ে ফিরেন সন্ধ্যার পর। পথে নানা ধকল সামলে আসতে হয়। ফলে অফিস থেকে ফিরে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। রূপনের পড়াশোনা কেমন চলছে এসব জানার সুযোগ হয় শুক্র-শনিবারে।

এ দুদিন রূপনের বাগানটা কেমন আছে দেখেন। রূপনের পড়াশোনা আর স্কুলের গল্প শোনেন। মাঝে মাঝে তাকে ঘুরতে নিয়ে বের হন। এভাবেই বাবার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর; যেটি বঙ্গবন্ধুর বাড়ি, ৩২ নং ধানমন্ডি– কয়েকবার দেখেছে রূপন। আর জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, শিশু একাডেমি, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান– এগুলোও ঘুরে দেখেছে সে। রূপনের খুব ইচ্ছা একবার বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ দেখার। বাবা কথা দিয়েছেন, অবশ্যই তিনি দু-দিনের ছুটি নিয়ে ওকে টুঙ্গিপাড়া দেখিয়ে আনবেন। শিশু একাডেমিতে একটা ছোটোদের জাদুঘর আছে। নাম শেখ রাসেল শিশু জাদুঘর। সেখানে রাসেলের অনেক স্মৃতি আছে। সেখানে গিয়ে তন্ময় হয়ে রূপন সেসব স্মৃতি দেখেছে। তার মন তখন থেকেই রাসেলের জন্য কেমন হয়ে ওঠে। রাসেল তো তার মতোই ছোট্ট ছিল। ক্লাস ফোরের রাসেল সোনা। ১৫ই আগস্টের সেই রাতের ঘটনা রূপন বাবার কাছে শুনেছে কয়েকবার। শুনে তার চোখ অশ্রুতে ছলছল করে উঠেছিল। সবার জন্যই তার কষ্ট হয়, কিন্তু ছোট্ট, তার মতোই ছোট্ট, ক্লাস ফোরে পড়া মায়া মুখের রাসেলকে ওরা কেন হত্যা করল। এ কথা ভাবতেই ঝরঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে রূপনের চোখ থেকে।

রূপন মন দিয়ে পড়াশোনা করে, ভালো কাজ করে

তাই সবাই তাকে ভালোবাসে। ঘটেছে আরেক কাহিনি। তখন শীতের সময়। রূপন একদিন একটা নতুন জাম্পার গায়ে দিয়ে স্কুলে যায়। কিন্তু বাড়ি ফিরে জাম্পার ছাড়া। মা তখন রূপনকে জিজ্ঞেস করে জাম্পারটা কোথায় রেখে এসেছ?

রূপন খুব স্বাভাবিকভাবেই জানায়, ওটা না আমি একটা ছোট্ট ছেলেকে দিয়েছি। আহা, মা, ছেলেটা ফুটপাতে খালি গায়ে বসে কাঁপছিল। জানো মা, ওকে দেখে আমার খুব কষ্ট হলো। তাই ভ্যান থামিয়ে জাম্পারটা খুলে ছেলেটাকে দিলাম। জানো মা, ওটা পেয়ে সে কী যে খুশি! তার হাসি দেখে খুব ভালো লাগল আমার। মা রূপনের বাবা বাসায় ফিরলে ঘটনাটি জানান।

বাবার খুব কৌতূহল হয় জানতে, তার এই ছোট্ট ছেলেটি কীভাবে, এত মানবিক হয়ে উঠল? তো সেদিন শুক্রবার। ছুটির দিন। বিকেলে রূপনকে নিয়ে বের হলেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সেই ঐতিহাসিক জায়গাটা দেখাবেন বলে। যেখানে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ১৯৭১-এর ৭ই মার্চে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন।

রূপন অবাক হয়ে বাবার পাশে দাঁড়িয়ে জায়গাটা দেখতে থাকে। তখন শেষ বিকেল প্রায়। দেখা শেষ হলে উদ্যান থেকে বের হয়ে টিএসসির কাছে এসে একটা রিকশা নিলেন। রিকশায় বসে রূপনের মাথায় হাত রেখে বাবা বললেন, রূপন সোনা, তোমাকে একটা প্রশ্ন করি? আচ্ছা তুমি যে কাজগুলো করো- মানে বাগান করা, স্কুলে ভালো পড়াশোনা করা, সহপাঠীদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা, উপস্থিত বক্তৃতা, জ্ঞান-জিজ্ঞাসা, আবৃত্তিতে প্রথম হওয়া– তো এতসব তুমি কার কাছ থেকে শিখেছ, বা কোত্থেকে এই ভালো কাজের প্রেরণা পাও?

ছোট্ট রূপন বাবাকে অবাক করে দিয়ে উত্তর দিল, বাবা, আমি এ-সবকিছুই বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে শিখেছি।

বাবা শুনে আরো বিস্মিত হলেন। কিন্তু আর কোনো প্রশ্ন করারও অবকাশ পেলেন না। কী বলবেন তিনি। এদিকে ছোট্ট রূপন বলেই যাচ্ছে– বাবা, বঙ্গবন্ধু মানুষকে ভালোবাসতেন। নিজের গায়ের জামা, চাদর খুলে গরিব মানুষকে দিয়ে আসতেন সেই ছোটোবেলায়। তিনি দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবাসতেন, গাছপালা ভালোবাসতেন, তিনি বই পড়তে ভালোবাসতেন, পাখি ভালোবাসতেন, সুন্দর কথা বলে মানুষকে আপন করে নিতেন। মানুষকে জাগিয়ে তুলতেন ভাষণ দিয়ে। আমি বই পড়ে বঙ্গবন্ধুকে জেনেছি। তিনিই আমার প্রেরণা। শুধু তিনিই। হ্যাঁ, বাবা ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন, আর ১৫ই আগস্ট তিনি শহিদ হয়েছিলেন। এদিন আমাদের জাতীয় শোক দিবস। এই দুই দিন জাতি বঙ্গবন্ধুকে বিশেষভাবে স্মরণ করে। জানো বাবা, আমি কিন্তু প্রতিদিন বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করি। প্রতিদিন সকালে তাঁর ছবির দিকে তাকিয়ে শ্রদ্ধা জানাই। আর বলি, বঙ্গবন্ধু– আমি যেন আপনার মতো ভালো মানুষ হতে পারি। আমার জন্য দোয়া করবেন।...

বাবা ওর কথা শুনতে শুনতে এমনই তন্ময় হয়ে পড়েন যে রিকশা বাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েই আছে। রূপন নেমে পড়েছে, কিন্তু তিনি বসেই আছেন। বাবা, আমরা এসে পড়েছি তো! –বলে রূপনই তাঁর তন্ময়তা ভাঙায়। বাবা রিকশা ভাড়া মিটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতেই রূপনকে কোলে তুলে নিলেন। রূপনও অবাক, সে এখন ক্লাস ফোরে পড়ে। বাবার কোলে তো ওঠে ছোটোরা! রূপন দেখে বাবার চোখ ছলছল করছে। ছলছল চোখে বাবা বললেন, রূপনবাবু, আমি কিছুই চাই না, শুধু চাই তোমার ভাবনার জয় হোক। তুমি যেন বঙ্গবন্ধুর মতো ভালো মানুষ হও।

রূপন বাবার দিকে নীরবে তাকিয়ে মাথাটা নিচু করে জানালো, হুম বাবা, আমি তেমনই হতে চাই। ■

শিশুসাহিত্যিক

প্রতিবাদী বঙ্গবন্ধু

সাহিদা বেগম

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন সম্পূর্ণ মানুষ। ভালো মানুষের যত গুণাবলি আছে সবই তাঁর মাঝে ছিল। তিনি ছিলেন তুখোর রাজনীতিবিদ, অতুলনীয় দেশপ্রেমিক, দয়াবান শাসক, প্রেমময় স্বামী, স্নেহশীল পিতা। বঙ্গবন্ধু ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু খেলাধুলা যেমন করতেন, তেমনি দুরন্তপনায়ও কম ছিলেন না। ছিলেন দলনেতা। তাঁর লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে কিছুটা ছোঁয়া আমরা পাই। তিনি লিখেছেন, 'আমার একটা দল ছিল। কেউ কিছু বললে আর রক্ষা ছিল না। মারপিট করতাম। আমার দলের ছেলেদের কেউ কিছু বললে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়তাম।'

দলবেধে যেমন দুষ্টুমি করতেন তেমনি শৈশব থেকেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন। ছোটো–বড়ো কারো কোনো অন্যায় বা জুলুমকে মেনে নিতেন না। 'বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে এভাবেই লিখেছেন সেটা ছিল ১৯৩৮ সালের ঘটনা। শেরে বাংলা তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং সোহরাওয়ার্দী শ্রমমন্ত্রী। তাঁরা গোপালগঞ্জ আসবেন। বিরাট সভার আয়োজন করা হয়েছে। এগজিবিশন হবে ঠিক হয়েছে। স্কুলের ছাত্র আমরা তখন। আমি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী করলাম দলমত নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে। পরে দেখা গেল, হিন্দু ছাত্ররা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী থেকে সরে পরতে লাগল। ব্যাপার কি বুঝতে পারছি না। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেও ছাত্র, সে আমাকে বলল, কংগ্রেস থেকে নিষেধ করেছে আমাদের যোগদান করতে। এক্সিবিশনে যাতে দোকানপাট না বসে। তাও বলে দেওয়া হয়েছে। তখনকার দিনে শতকরা আশিটি দোকান হিন্দুদের ছিল আমি এ খবর শুনে আশ্চর্য হলাম। কারণ, আমার কাছে তখন হিন্দু-মুসলমান বলে কোনো জিনিস ছিল না। হিন্দু ছেলেদের সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। এক সাথে গান- বাজনা, বেড়ান- সবই চলত। ...

এই সময় একটা ঘটনা হয়ে গেল। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একটু আড়াআড়ি চলছিল।

গোপালগঞ্জ শহরের আশপাশেও হিন্দু গ্রাম ছিল। দু' একজন মুসলমানের উপর অত্যাচার হলো। আবদুল মালেক নামে আমার এক সহপাঠী ছিল। সে খন্দকার শামসুদ্দীন সাহেবের আত্মীয় হতো। একদিন সন্ধ্যায়, আমার মনে হয় মার্চ বা এপ্রিল মাস হবে, আমি ফুটবল মাঠ থেকে খেলে বাড়িতে এসেছি; আমাকে খন্দকার শামসুল হক ওরফে বাসু মিয়া মোক্তার সাহেব (পরে মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন) ডেকে বললেন, 'মালেককে হিন্দু মহাসভা সভাপতি সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে ধরে নিয়ে মারপিট করছে। যদি পার একবার যাও। তোমার সাথে ওদের বন্ধুত্ব আছে বলে ছাড়িয়ে নিয়ে আস'। আমি আর দেরি না করে কয়েকজন ছাত্র ডেকে নিয়ে ওদের ওখানে যাই এবং অনুরোধ করি ওকে ছেড়ে দিতে। রমাপদ দত্ত নামে এক ভদ্রলোক আমাকে দেখেই গাল দিয়ে বসল। আমিও তার কথার প্রতিবাদ করলাম এবং আমার দলের ছেলেদের খবর দিতে বললাম। এর মধ্যে রমাপদরা থানায় খবর দিয়েছে। তিনজন পুলিশ এসে হাজির হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম , ' ওকে ছেড়ে দিতে হবে, না হলে কেড়ে নেব।' আমার মামা শেখ সিরাজুল হক (একই বংশের) তখন হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করতেন। তিনি আমার মা ও বাবার চাচাত ভাই। নারায়ণগঞ্জে আমার এক মামা ব্যাবসা করেন, তার নাম শেখ জাফর সাদেক। তার বড়ো ভাই ম্যাট্রিক পাস করেই মারা যান। আমি খবর দিয়েছি শুনে দলবল নিয়ে ছুটে এসেছেন। এর মধ্যেই আমাদের সাথে মারপিট শুরু হয়ে গেছে। দুই পক্ষে ভীষণ মারপিট হয়, আমরা দরজা ভেঙে মালেককে কেড়ে নিয়ে চলে আসি।

শহরে খুব উত্তেজনা। আমাকে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। সেদিন রবিবার। আব্বা বাড়ি গিয়েছিলেন। পরদিন ভোরবেলায় আব্বা আসবেন। বাড়ি গোপালগঞ্জ থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে। আব্বা শনিবার বাড়ি যেতেন আর সোমবার ফিরে আসতেন, নিজেরই নৌকা ছিল। হিন্দু নেতারা রাতে বসে হিন্দু অফিসারদের সাথে পরামর্শ করে একটা মামলা দায়ের করল। হিন্দু নেতারা থানায় বসে এজাহার ঠিক করে দিলেন। তাতে খন্দকার শামসুল হক মোক্তার সাহেব হুকুমের আসামি। আমি খুন করার চেষ্টা করেছি, লুটপাট দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগিয়ে দিয়েছি। ভোরবেলায় আমার মামা, মোক্তার সাহেব, খন্দকার শামসুদ্দীন আহমেদ এমএলএ সাহেবের মুহুরি জহুর শেখ, আমার বাড়ির কাছের বিশেষ বন্ধু শেখ নুরুল হক ওরফে মানিক মিয়া, সৈয়দ আলী খন্দকার, আমার সহপাঠী আবদুল মালেক এবং অনেক ছাত্রের নাম এজাহারে দেয়া হয়েছিল। কোনো গণ্যমান্য লোকের ছেলেদের বাকি রাখে নাই। সকাল ন'টায় খবর পেলাম আমার মামা ও আরো অনেককে গ্রেফতার করে ফেলেছে। আমাদের বাড়িতে কি করে আসবে- থানার দারোগা সাহেবদের একটু লজ্জা করছিল! প্রায় দশটার সময় টাউন হল মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে দারোগা আলাপ করছে, তার উদ্দেশ্য হলো আমি যেন সরে যাই। টাউন হলের মাঠের পাশেই আমার বাড়ি। আমার ফুফাত ভাই, মাদারীপুর বাড়ি। আব্বার কাছে থেকেই লেখাপড়া করত, সে আমাকে বলে, 'মিয়াভাই, পাশের বাসায় একটু সরে যাও না'। বললাম,'যাব না, আমি পালাব না । লোকে বলবে, আমি ভয় পেয়েছি।' এই সময় আব্বা বাড়ি থেকে ফিরে এসেছেন। দারোগা সাহেবও তাঁর পিছে পিছে বাড়িতে ঢুকে পড়েছেন। আব্বার কাছে বসে আস্তে আস্তে সকল কথা বললেন। আমার গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখালেন। আব্বা বললেন, 'নিয়ে যান'। দারোগা বাবু বললেন, 'ও খেয়েদেয়ে আসুক, আমি একজন সিপাহি রেখে যেতেছি, এগারোটার মধ্যে যেন থানায় পৌঁছে যায়। কারণ, দেরি হলে জামিন পেতে অসুবিধা হবে।' আব্বা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মারামারি করেছ?' আমি চুপ করে থাকলাম, যার অর্থ 'করেছি'। আমি খাওয়া-দাওয়া করে থানায় চলে এলাম। দেখি আমার মামা, মানিক, সৈয়দ আরও সাত আটজন হবে, তাদেরকে পূর্বেই গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে এসেছে। আমার পৌঁছার সাথে সাথে

কোর্টে পাঠিয়ে দিল। হাতকড়া দেয় নাই, তবে সামনেও পুলিশ পিছনেও পুলিশ। কোর্ট দারোগা হিন্দু ছিলেন, কোর্টে পৌঁছার সাথে সাথে আমাদের কোর্ট হাজতের ছোটো কামরার মধ্যে বন্ধ করে রাখলেন। কোর্ট দারোগার রুমের পাশেই কোর্ট হাজত। আমাকে দেখে বলেন, 'মজিবর খুব ভয়ানক ছেলে। ছোরা মেরেছিল রমাপদকে। কিছুতেই জামিন দেওয়া যেতে পারে না'। আমি বললাম, 'বাজে কথা বলবেন না, ভাল হবে না।' যারা দারোগা সাহেবের সামনে বসেছিলেন, তাদের বললেন, ' দেখো ছেলের সাহস!' আমাকে অন্য সকলে কথা বলতে নিষেধ করল। পরে শুনলাম, আমার নামের এজাহার দিয়েছে এই কথা বলে যে, আমি ছোরা দিয়ে রমাপদকে হত্যা করার জন্য আঘাত করেছি। তার অবস্থা ভয়ানক খারাপ, হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে রমাপদের সাথে আমার মারামারি হয় একটা লাঠি দিয়ে, ও আমাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে চেষ্টা করলে আমিও লাঠি দিয়ে প্রত্যাঘাত করি। যার জন্য ওর মাথা ফেটে যায়। মুসলমান উকিল মোক্তার সাহেবেরা কোর্টে আমাদের জামিনের আবেদন পেশ করল। একমাত্র মোক্তার সাহেবকে টাউন জামিন দেওয়া হলো। আমাদের জেল হাজতে পাঠানোর হুকুম হলো। এসডিও হিন্দু ছিল, জামিন দিলো না। কোর্ট দারোগা আমাদের হাতকড়া পরাতে হুকুম দিল। আমি রুখে দাঁড়ালাম, সকলে আমাকে বাধা দিল, জেলে এলাম। সাবজেল, একটা মাত্র ঘর। একপাশে মেয়েদের থাকার জায়গা, কোনো মেয়ে আসামি না থাকার জন্য মেয়েদের ওয়ার্ডে রাখল। বাড়ি থেকে বিছানা, কাপড় এবং খাবার দেবার অনুমতি দেয়া হলো। শেষ পর্যন্ত সাত দিন পরে আমি প্রথম জামিন পেলাম। দশ দিনের মধ্যে আর সকলেই জামিন পেয়ে গেল।

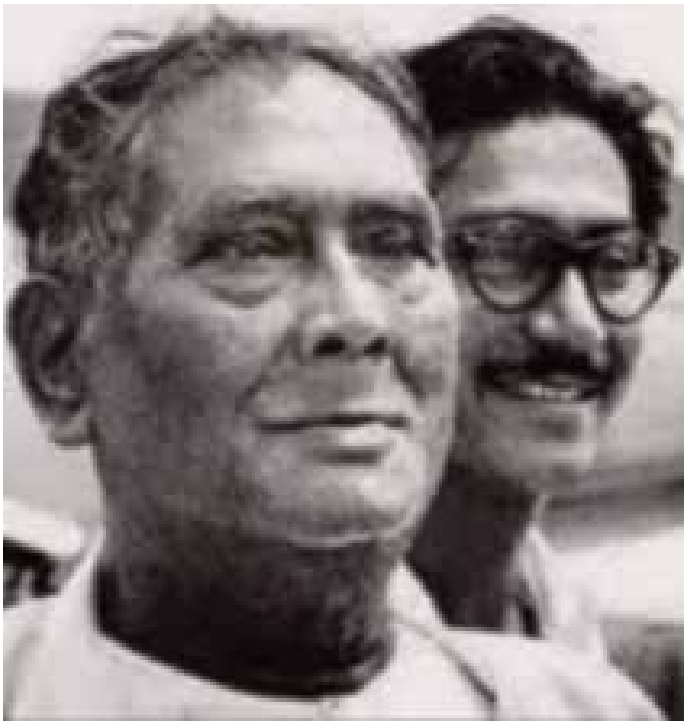

হক সাহেব ও সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে টেলিগ্রাম করা হলো। লোকও চলে গেল কলকাতায়। গোপালগঞ্জে ভীষণ উত্তেজনা চলছিল। হিন্দু উকিলদের সাথে আব্বার বন্ধুত্ব ছিল। সকলেই আমার আব্বাকে সম্মান করতেন। দুই পক্ষের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়ে ঠিক হলো মামলা তারা চালাবে না। আমাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে পনেরো শত টাকা। সকলে মিলে সেই টাকা দিয়ে দেওয়া হলো। আমার আব্বাকেই বেশি দিতে হয়েছিল। এই আমার জীবনে প্রথম জেল।(অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ১২-১৩) বঙ্গবন্ধুর ছাত্র জীবনে, মোট কথা স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন যে জেল জীবন শুরু হলো, পরবর্তীতে জীবনের বেশিরভাগ সময় তাঁর কেটেছে জেল জীবনে। ■

গবেষক ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

খোকা খুব পাখি ভালোবাসত

দিলরুবা নীলা

ওশিন 'ঘুমাচ্ছ না কেন, দাদু?
দাদু, আমার আজ মোটেও ঘুম আসছে না। কাল ২৬শে মার্চ। মহান স্বাধীনতা দিবস, কাল স্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। আমি বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

অভিনয় করে দেখাব। আমার ভীষণ টেনশন হচ্ছে।
আমি পারব তো দাদু?
অবশ্যই পারবে, তুমি না পারলে আর কে পারবে? তুমি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার নাতনি। তোমাকে তো পারতেই হবে।
দাদু, স্বাধীনতা মানে কী?
স্বাধীনতা মানে হলো মুক্তি। এই যে তুমি এখন ছোটো। ক্লাস ফোরে পড়। তোমার কাজ হলো লেখাপড়া করা, খেলাধুলা করা। এখন যদি তোমাকে এগুলো করতে না দেওয়া হয় তাহলে তোমার কেমন লাগবে।
আমার খুবই মন খারাপ হবে।
তারপর ধরো আমাদের সজনে গাছের ডালে যে টুনটুনিটা বাসা বেঁধেছে তাকে যদি তুমি ঘরে এনে খাঁচায় পুরে রাখো, তাহলে তার কেমন লাগবে?
খুব খারাপ লাগবে দাদু।
এই যে, ছোটো বাচ্চাদের পড়তে দেওয়া, খেলতে দেওয়া, পাখিদের উড়তে দেওয়া, এগুলো সবই স্বাধীনতা। ১৯৭১ সালের আগে বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের একটা অংশ। এর নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। আর পাকিস্তানকে বলা হতো পশ্চিম পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানি মানে আমাদের সব স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চেয়েছিল।
তারপর! তারপর কী হলো, দাদু।
তারপর বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন। তিনি বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীন দেখতে চেয়েছিলেন।
দাদু আমি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানতে চাই। তিনি ছোটোবেলায় কেমন ছিলেন? কী ভালোবাসতেন, বলবে আমাকে?
অবশ্যই বলব, দাদু।
তবে শোন,
'বঙ্গবন্ধু ছোটোবেলা থেকেই খুব দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। ঘরে আটকে রাখা যেত না। সারাদিন পাড়া মহল্লা মাতিয়ে রাখতেন। তার নাম ছিল খোকা। সেই খোকা, ফুল ভালোবাসত, পাখি ভালোবাসত, গাছ ভালোবাসত, প্রকৃতি ও মানুষের সাথে তাঁর ছিল গভীর মিতালি। গ্রামের পাশেই ছিল মধুমতি নদী। খোকা সেই মধুমতি নদীতে সাঁতরে বেড়াত। নদীর স্রোতকে একটুও ভয় পেত না।'
খোকা তো তাহলে অনেক সাহসী ছিল?
অবশ্যই অনেক সাহসী ছিল। সাহসের সঙ্গে সঙ্গে তার একটি মায়াভরা মনও ছিল। ছোটোবেলা থেকেই দুখী মানুষের দুঃখ দেখে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত। একটু বড়ো হয়েই খোকা একটি মানবতাবাদী সংঘের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।
সংঘ কী দাদু?
সংঘ হচ্ছে কয়েকজন উৎসাহী মানুষ নিয়ে তৈরি সংগঠন। তাদের কাজ ও লক্ষ্য নির্ধারিত থাকে।
খোকাদের সংঘের কাজ কী ছিল?
খোকা ও তাঁর বন্ধুরা মিলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল ডাল সংগ্রহ করে গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দিত।
বাহ্ দারুণ তো।
অবশ্যই দারুণ। খোকা কখনও নিজের একার কথা ভাবেনি, সে ভাবত তার পুরো দেশ নিয়ে, সারাদেশই যেন তাঁর পরিবার।
আরো বলো দাদু, আমি আরো শুনতে চাই।
এখন ঘুমাও দাদু, রাত অনেক হলো।
না। দাদু আমি এখনই শুনব। একরাত দেরি করে ঘুমালে কিছুই হবে না।
তাহলে শোনো, দিনে দিনে খোকা বড়ো হতে থাকে, রাজ্যের চিন্তা তার মাথার মধ্যে, দেশের মানুষের এত কষ্ট কেন। কেন কেউ গরিব, কেউ ধনী। মানুষে মানুষে এত ভেদাভেদ কেন।
তারপর!
এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা নানা ভাবে আমাদের অত্যাচার করতে থাকে। আর খোকা করত এর প্রতিবাদ। আর এজন্য বারবার তাঁকে বন্দি করা হতো কারাগারে।
কারাগারে থাকতে খোকার কষ্ট হতো না, দাদু?
অবশ্যই হতো, প্রকৃতির মাঝে যে থাকতে ভালোবাসেন তাঁকে আটকে রাখলে কষ্ট তো হবেই। কারাগারে বসেও সে প্রকৃতির সাথে, পাখিদের সাথে মানুষের সাথে মিতালি করতে চেষ্টা করত। এরকম অনেক ঘটনা আছে।
আমি শুনব, দাদু।
কাল তোমার অনুষ্ঠান, সকালে উঠতে হবে তো।

তাড়াতাড়ি না ঘুমালে সকালে উঠবে কীভাবে?

দাদু আমি ঠিকঠিক উঠতে পারব। আমি আজই শুনতে চাই।

আচ্ছা শোনো তাহলে– একবার খোকা কারাগারে, সেখানকার বাবুর্চি মোরগ পালত। হঠাৎ মোরগটা অসুস্থ হয়ে পড়ল। বাবুর্চি তাকে ঔষধ খাইয়ে সুস্থ করল। সে মোরগটিকে জবাই করতে চাইল। খোকার মন খারাপ হয়ে গেল। দীর্ঘদিন মোরগটাকে দেখতে দেখতে মোরগটার প্রতি মায়া জন্মে গিয়েছিল। খোকার মন খুব খারাপ লাগল কথাটা শুনে। সে বলল, না, 'জবাই করার দরকার নাই, ও বেশ বাগান দিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ওর চলাফেরার ভঙিমা দেখে আমার ভালো লাগে।'

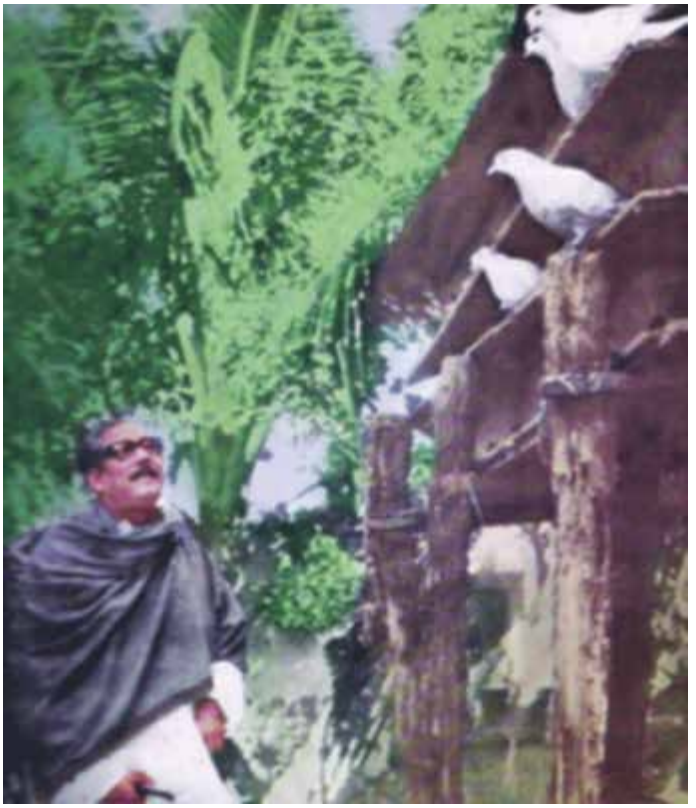

তারপর?

তারপর আর কী, এরকম আরো অনেক ঘটনা আছে।

বলো দাদু, আমি শুনব।

আবারও একবার খোকাকে কারাগারে রাখা হলো। খোকার ভীষণ মন খারাপ হলো। এ কেমন দেশ। নিজের অধিকারের কথা বলা যাবে না। বললেই জেলে পুরে দেবে, কী ভয়ংকর ব্যাপার।

তাই তো, এ কেমন কথা!

কারাগারে বসে সব সময় খোকা গাছ খুঁজত, পাখি খুঁজত, আকাশ খুঁজত। সে সময় তার রুমের পাশেই একটা বড়ো গাছ ছিল। খোকা সকালে বিকালে যখনই সময় পেতেন ওই গাছের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। গাছে ছিল দুটো পাখি। অসম্ভব সুন্দর পাখি দুটোর সাথে তার চোখে চোখে মিতালি হয়েছিল। এই অসম্ভব সুন্দর পাখি দুটিকে সে খুব ভালোবেসেছিল। হয়ত পাখিও তাঁর ভালোবাসা বুঝতে পেরেছিল। নইলে কেন-ই বা রোজ রোজ এই গাছে এ সময়ই আসবে।

আমারও তাই মনে হয়। খোকা যেমন পাখি দুটোকে ভালোবাসতেন। পাখি দুটোও খোকাকে।

হ্যাঁ, তাই। কিছুদিন পরে কারাগার থেকে মুক্তি পেল খোকা। কিন্তু পাখি দুটো তার মনের মধ্যে গেথে রইল।

তারপর কী হলো, দাদু?

তারপর কয়েক বছর পরে আবার খোকাকে বন্দি করে কারাগারের একই রুমে রাখা হলো। খোকা প্রথমেই পাখি দুটোকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেল না। খোকার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ভেবে পেল না কী করে তার ভালোবাসার ঐ পাখি দুটোকে ছাড়া সে বন্দি জীবন কাটাবে?

হয়ত খোকা চলে যাওয়ায় কষ্ট পেয়ে পাখি দুটোও ঐ গাছ ছেড়ে অন্য গাছে চলে গিয়েছিল।

হয়ত তাই। পাখিরাও ভালোবাসার মূল্য দিতে জানে। আমাদের খোকা যে খুব পাখি ভালোবাসতেন। ■

শিশু সাহিত্যিক

চেতনায় বঙ্গবন্ধু

শেলি শেলিনা

বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্বাধীনতার রূপকার। তিনি শুধু বাঙালির নয়, ভারতীয় উপমহাদেশের একজন অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর ব্যক্তিত্ব হিমালয় শৃঙ্গের চাইতেও উঁচু। তাঁর হৃদয়ের বিশালতার কাছে হার মানে মহাসমুদ্র, তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তা ইস্পাতের চাইতেও শক্ত, কঠিন এবং তাঁর দেশপ্রেম পৃথিবীর যে-কোনো প্রবল আকাঙ্ক্ষার চাইতেও দৃঢ়। তিনিই তো আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ বাঙালি জাতির এই মহান নেতা ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম শেখ লুৎফর রহমান। মায়ের নাম সায়েরা খাতুন। বাবা শেখ লুৎফর রহমান গোপালগঞ্জ দায়রা আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। মা সায়েরা খাতুন ছিলেন গৃহিণী। মা-বাবা উভয়েই এলাকার সজ্জন, পরোপকারী ও পরহেজগার

লোক ছিলেন। বাবা-মা আদর করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে খোকা বলে ডাকতেন।

এই খোকাই আমাদের জাতির পিতা, বাঙালি ও বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি সংগ্রামের অবিস্মরণীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাংলাদেশের সর্বময় মানুষের বুকের ভেতর খোদাই করা এক শাণিত নাম। শোষিত নিপীড়িত বাঙালির মুক্তি, একটি স্বাধীন দেশের জন্য তাঁর আমৃত্যু লড়াই, সংগ্রাম, আত্মাহুতি, পৃথিবীর ইতিহাসে অবিস্মরণীয় অনন্য দৃষ্টান্ত। শুধু তিনিই পেরেছেন আজন্ম লালিত মুক্তির স্বপ্নে এমন নিবিড় হয়ে থাকতে। এতটা নিবিষ্ট আত্মত্যাগ শুধু তাঁর মতো সর্বজনীন নেতার পক্ষেই সম্ভব।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন ক্যারেশমেটিক লিডার– যাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব ও দুর্দমনীয় প্রেরণা জনগণকে তথা জাতিকে পথ দেখিয়েছিল। শত শত বছরের পরাধীন হতাশাগ্রস্ত, দারিদ্র্যপীড়িত, শিক্ষা-দীক্ষা বঞ্চিত মৃতপ্রায় বাঙালি জাতিকে তিনি তাঁর জাদুকরী নেতৃত্বে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিলেন। অশ্রুর সাগর ও রক্তের নদী সাঁতরে বাংলার জনগণ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ছিনিয়ে এনেছিলেন স্বাধীনতা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা। তিনি আমাদের দিয়েছেন প্রাণভরে নিজেদের জাতীয় সংগীত গাইবার আনন্দ। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি পেয়েছে স্বতন্ত্র ও স্বকীয় জাতিসত্তার পরিচিতি। এই পরিচিতি আমাদের জন্য গৌরবের, অহংকারের। তাই আমরা বলি বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা একইসূত্রে গাঁথা। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্বাধীনতার রূপকার। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, আটান্নর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ছেষট্টির ৬ দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তির ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক এবং স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। বঙ্গবন্ধু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে কখনো আপোশ করেননি। ফাঁসির মঞ্চেও তিনি বাংলা ও বাঙালির জয়গান গেয়েছেন। দীর্ঘ চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে এই মহান নেতা ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করি ■

সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

ছবিতে বঙ্গবন্ধু

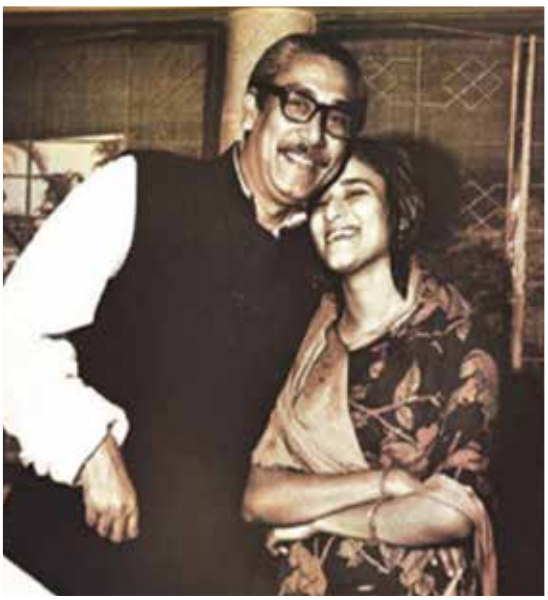

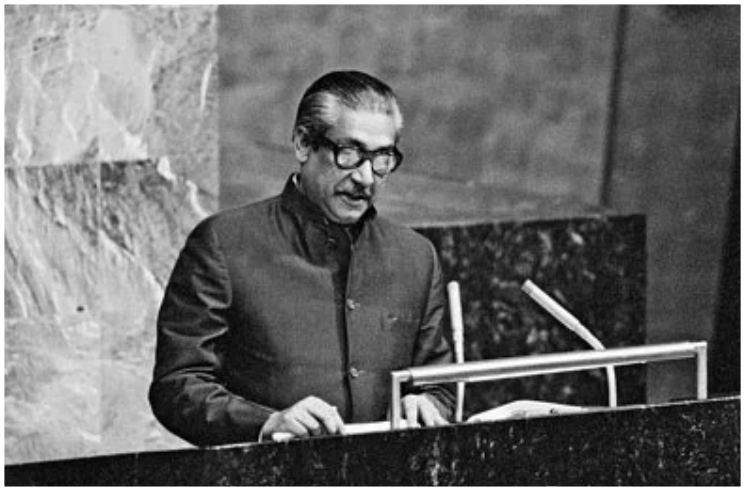

জয় বাংলা

এখন জাতীয় স্লোগান

তর্জনীটা শক্তি জোগায়

জিয়া হক

দীর্ঘ ন'মাস যুদ্ধ বিগ্রহ লক্ষ মা-বোন কাঁদে
আমার আকাশ-বাতাস ভারি করুণ আর্তনাদে
আগুন জ্বলে ঘরের ভেতর আগুন মায়ের বুকে
সোহাগি বোন ফুঁপিয়ে ওঠে, কই সোনা টুকটুকে!

বাবা গেলেন আর ফেরেনি, হাজার স্মৃতি জমা
তলিয়ে গেল অনন্ত সুখ-স্বপ্ন প্রিয়তমা
পালায় দুঃখে পূর্ণিমা চাঁদ জোছনাবিহীন রাত
দুধমাখা ভাত বিষাক্ত ইশ, বিপদ অকস্মাৎ।

মায়ের বোনা নকশিকাঁথায় পাক সেনাদের থাবা
সোনার দেশই ভস্ম হবে যায় কি মোটে ভাবা!
নীল যমুনা লাল হয়ে যায় সূর্যেও দেখ খুন
আমার সোনার বাংলা হারায় বসন্ত-ফাল্গুন।

ইতিহাসের বাস্তবতা দুখের পরেই সুখ
পবিত্র ভোর আনতে টেনে বাঙালি উন্মুখ
জয় বাংলা তর্জনীটা শক্তি জোগায় ঢের
কামাল, হামিদ, মুন্সি, মতি নাম কী আতঙ্কের!

'মুক্ত করে ছাড়ব' কানে বাজছে বারংবার
সেই বারুদেই দামাল ছেলে ভুলেছে সংসার
অস্ত্র হাতে জীবন দিয়ে বিছায় ফুলের মালা
দীর্ঘ ন'মাস যুদ্ধ ভীষণ ভাঙল শিকল-তালা।

অরুণ-রাঙা গোলাপকলি গন্ধ-সুধা ঢালে
পাখনা মেলে প্রজাপতি, ছন্দ ডালে ডালে
বিশ্ব তাকায় বিস্ময়ে আহ! জয় বাংলার জয়
বাংলা আমার বুকের পাটা চিরন্ত সঞ্চয়।

পিতা তোমাকে

চন্দনকৃষ্ণ পাল

কখনো হঠাৎ অবসর পেলে যদি কোনো কিছু ভাবি
ভাবনার নীল সাগরটা জুড়ে খুব করে খাই খাবি।
জল রঙে আঁকা ক্যানভাস জুড়ে কি যে মোহময় ছবি
চাঁদের আলোর স্নিগ্ধ মায়া, শেষ বিকেলের রবি।
সেই রবিটা একটা মুখেই তার আলো ধরে রাখে
রূপামাখা চাঁদ সে মুখটাতেই আলোময় ছবি আঁকে।
ব্যাকব্রাশ চুল,কালো চশমায় দীঘল দেহের তুমি
হাজার বছরে এনেছে তোমায় আমার জন্মভূমি।
রাখতে পারিনি তোমায় ধরে তো চলে গেলে তুমি কই?
পূর্ণিমা রাতে ধু ধু মাঠ পানে তাকিয়ে আমি যে রই।
মাঠ পার হয়ে আসবে হয়ত ভেবে ভেবে হই সারা
কতদিন হলো জানো প্রিয় পিতা আমরা তোমায় ছাড়া-
বিষণ্ন মনে দিনটা কাটাই, রাত্রি কাটাই ঘোরে
মৃদু আলো নিয়ে চাঁদ চলে যায় আনমনা সব ভোরে।
বুকে ব্যথা নিয়ে দিন শুরু করি ছন্দবিহীন দিন
জানি না কবে যে শোধব তোমার আকাশ ছোঁয়া এ ঋণ।

জাতির পিতা

উৎপলকান্তি বড়ুয়া

আগস্টের আজ এই না দিনে দেখরে চেয়ে দেখ,
মন করে ভার থমকে আছে ধানমন্ডির লেক।
লেকের পাড়ের অমল সবুজ গাছগাছালি পাতা,
মন করে ভার কেমন করে নুইয়ে আছে মাথা!

পায়রা খোপে বসেই আছে মনটা করে ভার,
রাসেল সোনার সাইকেলও চুপ জং ধরেছে তার।
আজকে নীরব মন খারাপের সরল জানালাটা,
কেমন নিথর বত্রিশের সরব আঙিনাটা!

মন খারাপের নয় সময় আর একবার দাঁড়াই ঘুরে,
এগোবো পথ, দুখ বেদনা শোককে রেখে দূরে।
সামনে শুভ সুবর্ণ রং সম্ভাবনার ঘটা,
সকলখানে ছড়িয়ে পড়ুক তার সে আলোর ছটা।

রাঙাবো চারপাশই, ঠেলে সকল বাধা জরা,
জাতির পিতার আদর্শ হোক ফুল-ফসলে ভরা।

বঙ্গবন্ধু প্রেরণার ঝিকিমিকি

সুফিয়া শিউলি

পনেরো আগস্ট পনেরো আগস্ট
আহা কেন তুই মহা কালরাত হয়ে গেলি...
যে শোক কখনো মোছে না সে শোক
কেন আমাদের মনে বিছিয়ে দিতে এলি।
কাঁদ-রে আকাশ... কাঁদ-রে বাতাস...
মেঘও কেঁদে-কেঁদে যদি কেটে যায় উদ্বেগও...
জনকের শোক শক্তি যোগাক বুকে
ছাই ফেলে দিক সর্বনাশার মুখে।
আমরা জিতব জিতব আমরা ঠিকই-
বঙ্গবন্ধু প্রেরণার ঝিকিমিকি!

যুদ্ধ জয়ের তুর্য

বোরহান মাসুদ

কার কথাতে ভূত পালালো অন্ধকারের রাতে
বীর বাঙালির সুখে দুখে কাকে পেলাম সাথে!
কার কথাতে খুব সাহসে উঠছে তুমুল হেঁকে
একাত্তরের রণাঙ্গনে জীবন বাজি রেখে।

কার কথাতে মুক্ত আকাশ মুক্ত পাখি উড়ে!
তাঁরই সকল গুণের কথা জানে বিশ্ব জুড়ে।
কার কথাতে আমরা পেলাম একটি স্বাধীন দেশ
তাঁর কথা আজ বলতে গিয়ে হয় না বলার শেষ।

কার কথাতে মায়ের ঘরে ঘোচায় কালরাত্রি
মহাকালের আলোয় বিভোর উদয় পথের যাত্রী।
কার কথাতে মুছে গেল দুখের কান্নাকাটি
আমরা পেলাম জয়ের ধ্বনি মুক্ত মায়ের মাটি।

কার কথাতে আঁধার পথে রাঙায় ভোরের সূর্য
তিনিই হলেন বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ জয়ের তূর্য।

তাঁকে আমি চোখে দেখিনি

রহিমা আক্তার মৌ

আমার জন্ম ১৯৭৪ সালের এক বছর পর। জন্মস্থান কুমিল্লা ময়নামতি সেনানিবাসে। বাবার কর্মসূত্রে তখন আমাদের কুমিল্লার ময়নামতি সেনানিবাসের কোয়ার্টারে থাকা। সবেমাত্র জাতির পিতার তত্ত্বাবধানে অভাবি দেশটা ঘাড় সোজা করে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। ১৯৭১ সালের নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে তো দেশের কোমর আর মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল পাকবাহিনী। তবুও দমে যায়নি বীর বাঙালিরা। শেখ মুজিবুর রহমান নামটির সাথে আমার পরিচয় নেই, আমার পরিচয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নামটির সাথে। কারণ ততদিনে শেখ মুজিবের নামের পাশে কয়েকটা গুণবাচক শব্দ যুক্ত হয়েছে।

'তাঁকে আমি চোখে দেখিনি', হ্যাঁ আমার জাতির

পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখার ভাগ্য হয়নি। উনার চলে যাওয়ার পরে আমার জন্ম। কিছু মানুষকে চোখে দেখে যে ভালোবাসতে হয় বা হবে তা কিন্তু নয়। না দেখেও যে ভালোবাসা যায়, শ্রদ্ধা করা যায়, তেমনই ব্যক্তি আমাদের বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুকে না দেখেই ভালোবেসেছি, ভালোবেসেছি উনার আদর্শ, ন্যায়নীতি, দেশ পরিচালনার দক্ষতা দেখে। দেশকে নিয়ে তাঁর রাজনৈতিক ভাষণ শুনে। উনার প্রিয় পোশাক দেখে। তাঁর সেই আঙুল উঁচু করে ভাষণ দেওয়াকে। দেশের রাজনীতির সাথে থাকার জন্যে বার বার তাঁকে কারাগারে যেতে হয়েছে। জানি না এতবার আর কোনো দেশের কোনো নেতাকে জেলে যেতে হয়েছে কি-না বা এতদিন জেলে থাকতে হয়েছে কি-না। বঙ্গবন্ধুর জেল জীবন নিয়ে পড়তে গিয়ে জানতে পারি,

'৫৪ বছর বয়সে বঙ্গবন্ধু ৪ হাজার ৬৮২ দিন কারাগারে ছিলেন। এর মধ্যে ১৯৩৮ সালে স্কুলের ছাত্র অবস্থায় ৭ দিন, বাকি ৪ হাজার ৬৭৫ দিন তাঁর জেলে কাটে পাকিস্তান আমলে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পাঁচ দিন, একই বছর ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৯ সালের ২১শে জানুয়ারি পর্যন্ত। ১৯৪৯ সালের ১৯শে এপ্রিল থেকে ২৮শে জুন ৮০ দিন, একই বছর সেপ্টেম্বরে ২৭ দিন, ২৫শে অক্টোবর থেকে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৩ দিন। ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ১৯৫২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি টানা ৭৮৭ দিন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয় লাভের পর ২০৬ দিন। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারির পর ১১ই অক্টোবর গ্রেপ্তার হন, তখন টানা এক হাজার ১৫৩ দিন তাঁকে কারাগারে কাটাতে হয়। ১৯৬২ সালের ৬ই জানুয়ারি থেকে ১৮ই জুন, ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে বিভিন্ন মেয়াদে বঙ্গবন্ধু ৬৬৫ দিন কারাগারে ছিলেন। ১৯৬৬ সালে ৮ই মে থেকে ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এক হাজার ২১ দিন কারাগারে ছিলেন। এইবার কারামুক্তির পর তাঁকে গণসংবর্ধনায় বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পরপরই পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে আবার গ্রেপ্তার করে। পাকিস্তানের মিয়ানালী কারাগারে একটি সেলের মধ্যে তাঁকে রাখা হয়। এ দফায় তিনি ছিলেন ২৮৮ দিন।' -(তথ্যসূত্রঃ তোফায়েল আহমেদ, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ৩রা মার্চ ২০১৭)

সেই স্কুল জীবন থেকেই বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছেন নেতৃত্বের। তিনি তারুণ্যের স্বপ্ন এবং প্রত্যাশাকে নিজের ভেতর লালন করতেন নিজের ভাবনা ভেবেই। বার বার জেলে গেলেও তিনি নিজের আদর্শকে ভুলে যাননি। বরং জেল থেকে বের হয়েই আবার নিজের আদর্শ ও ন্যায়নীতি নিয়েই ভেবেছেন। উনার পরিবারও সব সময় পাশে থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করেছেন। সুফিয়া কামালের এক লেখায় পড়েছি,

'যখন তখনই শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগারে যেতে হয়েছে। কারাগারে নেওয়া হয়েছে শুনলেই যেতাম শেখ মুজিব-এর বাড়ি। গিয়ে দেখতাম শেখ ফজিলতু নেছা মুজিব কাপড়চোপড়, বালিশ-বিছানা গুছিয়ে পাঠাচ্ছে কারাগারে। এমন দৃশ্য অনেকবার দেখেছি আমি নিজেই।'

১৯৭৫ থেকে ২০২২ সাল শুধু নয়, যুগে যুগে বঙ্গবন্ধুর সত্যিকারের আদর্শকে যারা লালন করে বা করবে তারা বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসেই করে আর করবে। বঙ্গবন্ধুর ছোটোবেলা পড়তে গিয়েই জানি কীভাবে তিনি দেশপ্রেমে আগ্রহী হয়ে উঠেন। স্কুলের গণ্ডি না পেরুতেই তিনি দেশের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল সেই ১৯৩৯ সালে মিশনারি স্কুলে পড়ার সময়। স্কুল পরিদর্শনে এসেছিলেন তদানীন্তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

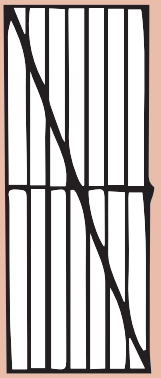

বঙ্গবন্ধুর কারাযাপন ৪,৬৮২ দিন

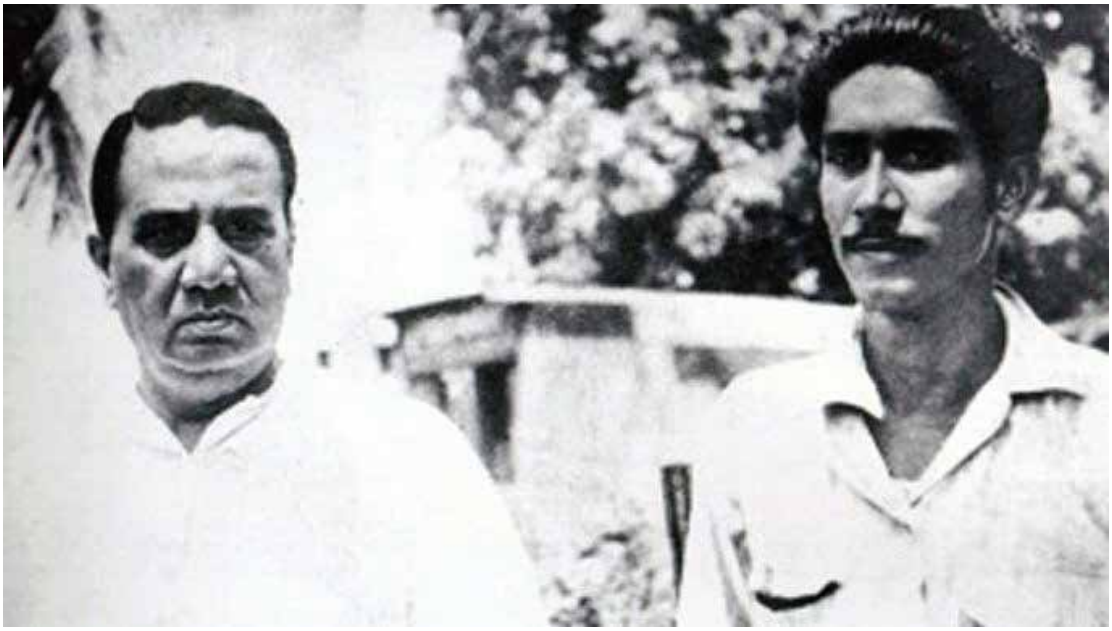

এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। স্কুলের ছাদ সংস্কারের দাবির উপর ভিত্তি করে একটি দল নিয়ে তাঁদের কাছে যান শেখ মুজিব নিজেই।

বঙ্গবন্ধু ১৯৪৩ সালেই সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে। তখনই তিনি বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং অগ্রণী কাশ্মিরী বংশোদ্ভূত বাঙালি মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে আসেন। এখানে তাঁর ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য বিষয় ছিল একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন। ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন তিনি। ক্রমেই তিনি রাজনীতির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়েন।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শিক্ষাবিদ, লেখক ও জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন,

'শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ১৯৩৯ সালে, ১৯ বছর বয়সে। তখন তিনি মুসলিম লীগের এবং সেই সূত্রে মুসলিম ছাত্রলীগের একজন সাধারণ কর্মী। পূর্ব পাকিস্তান-দাবির ঘোর সমর্থক হলেও তাঁর মনের গঠনটা ছিল অসাম্প্রদায়িক।' -(তথ্যসূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ই ডিসেম্বর ২০১৬)

রাজনীতির প্রথম থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তরুণদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। শুধু স্কুল জীবন বা কলেজ জীবনে নয়, তরুণদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল সব সময়। সেই ১৯৭৫ হোক আর ২০২২ সাল, আমার বিশ্বাস এই জনপ্রিয়তা থাকবে যুগের পর যুগ। ১৯৪৭-এ ভারত বিভাগ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির প্রাথমিক পর্যায়ে শেখ মুজিব ছিলেন তরুণ ছাত্রনেতা। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি তরুণদের সাথে নিয়েই আন্দোলনে থাকেন। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের পতন ঘটানোর পেছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৮ সালে ভারত সরকারের সাথে যোগসাজশ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বঙ্গবন্ধুর বিচার শুরু হয় এবং পরবর্তীতে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বিপুল বিজয় অর্জন করে। নির্বাচনে বিপুল ভোটে আওয়ামী লীগ জয়ী হবার পরও নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। পাকিস্তানের নতুন সরকার গঠন বিষয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের

রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে শেখ মুজিবের আলোচনা বিফলে যাওয়ার পর ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাত্রে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকা শহরে গণহত্যা পরিচালনা করে। একই রাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়।

বাবার মুখে শুনেছি বঙ্গবন্ধুর কথা, মায়ের মুখে শুনেছি বঙ্গবন্ধুর কথা। সেই ছোটোবেলা থেকে মা-বাবার মুখে শুনে শুনেই বঙ্গবন্ধুকে একটু একটু করে ভালোবেসেছি। বঙ্গবন্ধুর সাথে বাবার সরাসরি দুইবার দেখা হয়, কথা হয়। বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা (মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মান্নান, সেক্টর-দুই) বাবা বলেন,

'আসলে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা উঠলেই আমরা নয় মাসের যুদ্ধের কথা বলি। এই নয় মাস তো হলো ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর মাসের কথা। ১৬ই ডিসেম্বর পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করলেও যুদ্ধের ইতি টানা হয় আরো পরে। ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তছনছ করা এই স্বাধীন দেশটাকে গোছানোর জন্যে অনেক পরিকল্পনা করেন। সামাজিক, অর্থনৈতিক সব দিক দিয়েই দেশটা ছিল ক্ষতবিক্ষত। সেই দেশটাকেই বঙ্গবন্ধু সাজিয়ে নিচ্ছিলেন। এগিয়ে যাচ্ছিলেন দেশকে নিয়ে, সেই সময় শুরু হলো দুর্ভিক্ষ। সেখান থেকে কেটে উঠে যখন সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টায় নিজেকে নিযুক্ত করলেন। ঠিক তখনই এই মহামানবের জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়া হয়।'

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম...' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠে ৭ই মার্চের ভাষণ শুনলেই মনে হয়, সেদিন যদি আমিও থাকতাম ঠিক যুদ্ধে যেতাম। মা বলেন-

'জানিস তুই তখন আমার পেটে। আমরা কুমিল্লা ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট-এ থাকি। বঙ্গবন্ধু আসবেন কুমিল্লায়, খুব ভোরে তোর আব্বা চলে যায়। বঙ্গবন্ধু আসার কিছু আগে আমাদের কোয়ার্টারে গাড়ি পাঠানো হয়। যারা যারা যাবে শেখ সাবকে দেখতে তারা এই গাড়িতে যাওয়ার জন্যে। আমার শরীর ভালো নেই। কিন্তু এত কাছে আসার পরও বঙ্গবন্ধুকে সরাসরি দেখতে পারব না তা মেনে নিতে পারিনি। তৈরি হয়ে চলে গেলাম। সামনাসামনি দেখলাম। বক্তৃতা শুনলাম। যাঁর কথা এতদিন রেডিওতে শুনেছি আজ সামনেই দেখলাম। দেখেই মনে হলো দেশের এই ক্লান্তিলগ্নে– এমন একজন মানুষের প্রয়োজন ছিল দেশ পরিচালনার জন্যে। আসলে যোগ্য ব্যক্তির হাতেই ছিল দেশের দায়িত্ব।'

আমরা যারা বঙ্গবন্ধুকে দেখিনি তারা বঙ্গবন্ধুর কর্মের কথা শুনে, দায়িত্বের কথা শুনে, দেশ পরিচালনার কথা শুনেই উনাকে ভালোবাসি। বঙ্গবন্ধু তারুণ্যের ক্ষোভ এবং দ্রোহের সঙ্গে একটা তাৎক্ষণিক সংযোগ ঘটাতে পারতেন। তাঁর সক্রিয়তা তিনি তরুণদের ভেতর সঞ্চারিত করতে পারতেন। যারা আমার বয়সি বা আমার থেকে ছোটো তারা তো তরুণ। এরা কেউই বঙ্গবন্ধুকে সরাসরি চোখে দেখেননি। গল্প শুনেছেন পরিবারের কাছে, গল্প শুনেছেন মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা সত্যিকারের ইতিহাস জেনেই। সেখান থেকেই তারা জেনেছে মুক্তিযুদ্ধকে, চিনেছে বঙ্গবন্ধুকে।

ছাত্র রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন রুশি চৌধুরী। ১৯৭৫ সালের অনেক পরে জন্ম তার। পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে জানার সুযোগ হয় উনার। বঙ্গবন্ধুকে কেমন করে চেনেন বা কী চোখে দেখেন এমন ভাবনায় রুশি চৌধুরী বলেন,

'আমি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যখন কোনো কথা বলতে যাই, আমার চোখের সামনে দুইটা জিনিস ভেসে ওঠে। প্রথমত; বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণ দিচ্ছেন আঙুল তুলে। আর ভেসে ওঠে বঙ্গবন্ধু সিঁড়িতে পড়ে আছেন...।' ■

সাহিত্যিক, কলামিস্ট ও প্রাবন্ধিক

গল্প

মামুনের স্বপ্ন

আজহার মাহমুদ

রাতের কোনো এক সময়ে মামুনের ঘুমটা ভেঙে যায়। মনটা অস্থিরতায় ছেঁয়ে আছে। অজানা এক দুঃশ্চিন্তা ঘিরে আছে মামুনের মনে। মনের ভিতর শুধুই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, কেন এমন স্বপ্ন দেখল? নিকটতম কারো কোনো বিপদ ঘনিয়ে আসছে না তো? নাকি বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর কোনো ক্ষতি হতে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ভাবনার কারণ হলো, স্বপ্নের কোনো একটা মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু নামটি কানে ভেসে এসেছিল। গভীর রাত, বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। বিছানা থেকে নেমে ঢকঢক করে দু-গ্লাস পানি খেয়ে নেয় মামুন। স্বপ্ন শুধুই স্বপ্ন– এর সাথে বাস্তবতার কোনো ছোঁয়া নেই, এই বলে নিজেকে নিজে আশ্বস্ত করতে থাকে মামুন। মন থেকে যতই আশঙ্কার ভাবনাটা সরিয়ে দিতে চায় ততই যেন জেঁকে বসে সেই ভাবনা। স্বপ্নে কী দেখেছে তা মনে করার চেষ্টা করে মামুন। মনে পড়তে থাকে– একে

একে। আবারও গভীর ঘুমে নিমগ্ন মামুন। স্বপ্নে মামুন দেখতে পায়, একটি রুমের মধ্যে গোপন বৈঠক হচ্ছে। দুর্বৃত্তরা নিচু গলায় আলাপ করছে। তাদের কথার কিছু বুঝা না গেলেও এটা অন্তত বুঝা যাচ্ছে কোনো একটা বিষয় নিয়ে সবাই বেশ উত্তেজিত। তবে তাদের মুখে বঙ্গবন্ধু নামটি স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়।

এর একটু পর মামুন দেখতে পাচ্ছে, কালো মুখোশে বেশ কয়েকজন দুর্বৃত্ত বাসভবনে প্রবেশ করে। হাতে তাদের অত্যাধুনিক রাইফেল। কালো মুখোশ পড়া মানুষগুলোর হাতে কালো কালো অস্ত্রগুলোর নল অন্ধকারেও কেমন চকচক করছে। রুমে প্রবেশ করেই সবাইকে ঘুম থেকে তুলে একটা কোনায় জড়ো করে বুক বরাবর অস্ত্র তাক করে দাঁড়িয়ে থাকে এক দুর্বৃত্ত। কিছুক্ষণ পর মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম। রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেদ করে অস্ত্রধারীরা কাপুরুষের মতো বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত মামুন ঠিক ছিল, কিন্তু এবার মামুন বিকট শব্দে চিৎকার দিয়ে উঠে। পাশের রুমে থাকা মামুনের মামা-মামি এসে মামুনকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করে কী হয়েছে?

মামুন তার স্বপ্নের কথা মামা-মামিকে বলল। তার মামা-মামি তাকে পানি খাইয়ে শান্ত করে বলল, কিচ্ছু হবে না। আমাদের বঙ্গবন্ধুর কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এটা বলে মামুনকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিলো তার মামা-মামি।

মামুনকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেও মামা-মামি আর ঘুমোতে পারছেন না। মামুনের স্বপ্নটা তাদের ভেতরেও চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে সামান্য। তবে সেটা ভিন্ন চিন্তা। তারা ভাবতে শুরু করছে বঙ্গবন্ধুর ক্ষতি করার লোক নেই বললেও ভুল হবে। মামুনের মামা মামুনের মামিকে বলেন, আমরা যখন যুদ্ধ করি তখন দেখি এদেশে অনেক রাজাকার গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরছে। অনেকেই বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করেছে। ক্ষতি করলে তারাই করবে। ঘুমোতে যাওয়ার আগে মামুনের মামা আবার বলল, কাল দেখি মামুনকে নিয়ে একবার বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে আসব।

রাতের অন্ধকার ভেদ করে পূর্ব আকাশে সূর্য উদিত হলো। তবে আকাশটা আজ কেমন জানি গুমোট হয়ে আছে। বাতাসেও যেন অক্সিজেনের পর্যাপ্ত মাত্রা সংকট। সূর্যটা যেন তার পূর্ণ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি। বাতাসে লাশের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। ফিসফাস করে এদিকওদিক গুঞ্জন। বাংলার মহানায়ক আর নেই। মহানায়কের রক্তে রঞ্জিত করে ঘাতকের বুলেট বাংলাদেশের মানচিত্রকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে।

এই খবর শুনে মামুনের মামা-মামি একদিকে বিচলিত অন্যদিকে অবাক। তাহলে কি মামুন স্বপ্নে যা দেখেছে তা সত্যি!

মামুনের মামা-মামি একজন অন্যজনের দিকে তাকিয়ে আছেন। মামুনের মামা অবশ্য কান্নাও করছেন। এরপর মামুনকে ডেকে আরো একবার পুরো স্বপ্নটা শুনেছেন। আর অবাক হচ্ছেন। রেডিওতে তেমনিই বলছে। এটা কীভাবে সম্ভব!

বঙ্গবন্ধুকে এবং বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে কারা হত্যা করেছে সেটা মামুন স্পষ্ট করে বলতে পারছে না। মামুনের স্বপ্নে গভীর রাতে মুখোশ পরা কিছু দুর্বৃত্তের আগমনের হেতুও জানা যাচ্ছে না। সেদিনের সেই স্বপ্নের কথা মামুন আজও ভুলতে পারে না। মামুনের সেই স্বপ্নের সাক্ষী ছিল তার মামা-মামি। তারা না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন বছর দশেক হচ্ছে। আজ মামুনের তিন ছেলে এক মেয়ে। কাউকে মামুন তার স্বপ্নটির কথা বলে না। শুধু মনে মনে আফসোস করে সেদিনের সেই স্বপ্নটা কেন সত্য হলো সেটা নিয়ে।■

প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম সময়

শোকের ছায়া বইছে দেশে

বাবুল তালুকদার

শোকের ছায়া বইছে দেশে কাঁদছে মানব হৃদয়
আনছে দেশে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার বিজয়।
ষড়যন্ত্রের কবলে পরে সপরিবার লোক
প্রাণ কেড়ে নেয় কুচক্রীরা মানব জাতির শোক।
ঘুরে আসে পনেরো আগস্ট মানব প্রাণ কাঁদে
চিহ্নিত আজ কুচক্রীরা পরছে এখন ফাঁদে।
বিচার হলো খুনিদের আজ মা ও মাটির দেশে
পালিয়ে যারা ভিনদেশে যায় থাকে ছদ্মবেশে।
মানব অন্তর কেঁদে যায় শোকের ছায়া ভাসে
কুচক্রীদের রক্ষা নেই পরছে সর্বনাশে।
জাতির পিতার জন্য আজ কাঁদছে দেশের লোক
সারা বিশ্বে বাঙালি জাতি পালন করছে শোক।
বঙ্গবন্ধুর মতো মানুষ আর হবে না বিশ্বে
স্বীকার করে বিশ্ববাসী শেখ মুজিবুর শীর্ষে
৭ই মার্চের ভাষণ শুনে কেঁপে উঠে বিশ্ব
এই পৃথিবীর মানচিত্রে হয়নি সে নিঃস্ব।

শ্রেষ্ঠ নেতা

মো. রকিব খান

বঙ্গবন্ধু বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান
টুঙ্গিপাড়ায় তাঁর জন্ম
তাঁর কারণে বাংলার মাটি
হয়েছে আজ ধন্য।

বাঙালিদের সাহস দিয়েছেন
মনে জুগিয়েছেন শক্তি
তিনি আমাদের জাতির পিতা
তাঁর প্রতি রইল শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে
বাঙালি পেয়েছে স্বাধীনতা
তাঁর সুনিপুণ নেতৃত্বের গুণে
মুক্ত হয়েছে পরাধীনতা।

বঙ্গবন্ধুকে জানতে হলে

মাহমুদুল হাসান মনি

তোমায় জানতে হলে
জানতে হবে দেশকে
জানতে হবে রক্তে রাঙানো
ভাষা আন্দোলন
জানতে হবে সাতই মার্চের
ঐতিহাসিক ভাষণ
জানতে হবে পঁচিশে মার্চ
স্বাধীনতার লড়াইকে
জানতে হবে মুক্তিযুদ্ধ
বিজয়ের শপথ
জানতে হবে পনেরো আগস্টের
স্বজন হারা রাতকে
জানতে হবে বাইগার নদী
থেকে বঙ্গোপসাগরের পথচলা
তবেই তো জানব
বঙ্গবন্ধু তোমায়।

দ্বাদশ শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা

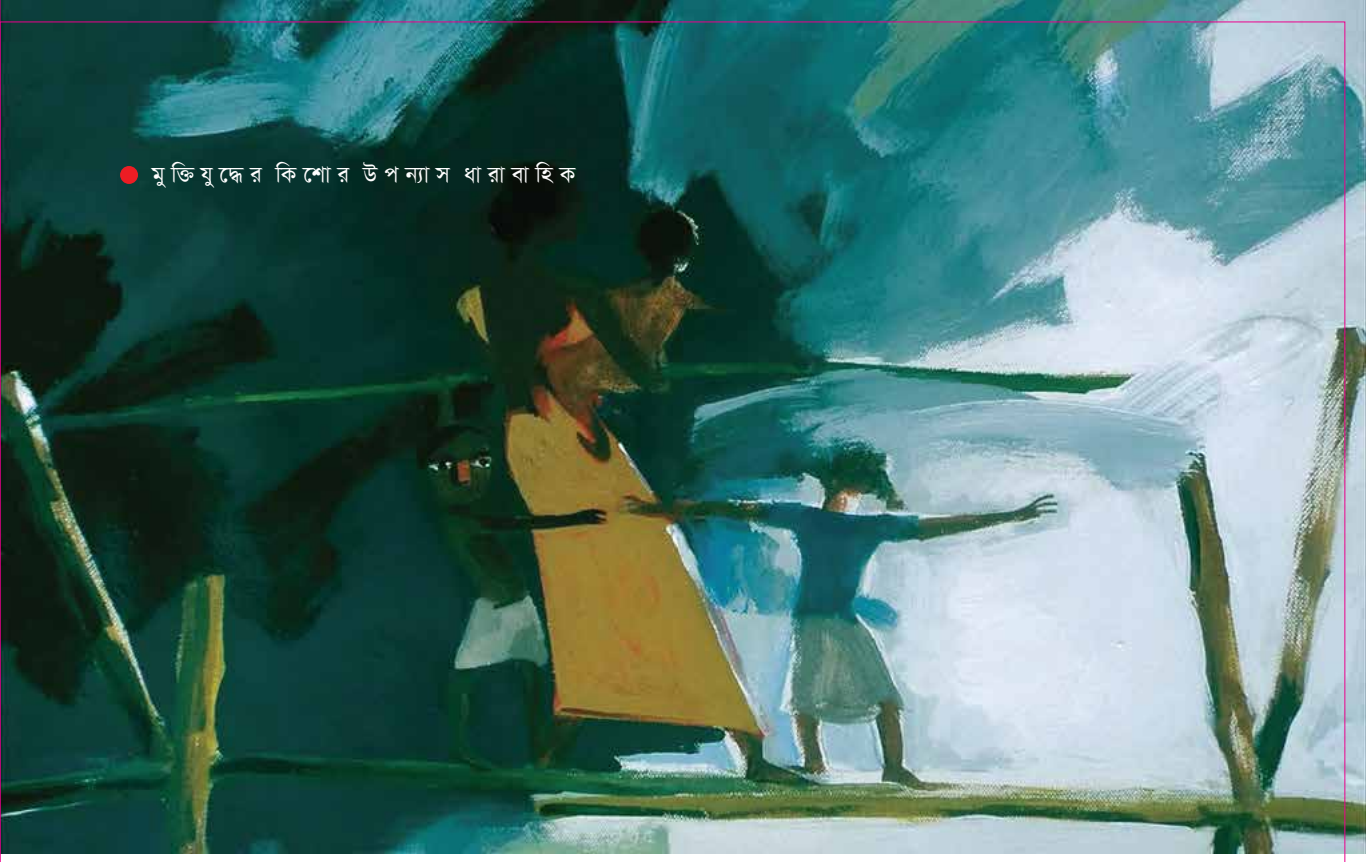

রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী

মুস্তাফা মাসুদ

[পূব প্রকাশিতের পর একাদশ পর্ব-১ম অংশ]

একজন বিলু আপা ও অপারেশন রতনপুর

রতনপুর থানা সদরের রাজাকার ঘাঁটি অপারেশন একদিকে আমার জন্য ছিল মহা-চ্যালেঞ্জিং, অন্য দিকে গর্বেরও। রাজাকার ক্যাম্পের একটু দূরেই বিলকিস আক্তার ওরফে বিলুদের বাড়ি। সে আমার খালাতো বোন। আমার এক বছরের সিনিয়র– আমি নিউ টেনে আর সে এ বছর এসএসসি পরীক্ষাথী ছিল, কিন্তু পরীক্ষা দিলো না। এ নিয়ে তার বাবা তবিবর মোল্লা, মানে আমার খালু অবশ্য কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। কারণটা তিনিও জানেন। দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। এলাকার কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-যুবক দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছে। অন্যদিকে বাঙালি নামধারী কিছু লোক হানাদার বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য রাজাকার বাহিনী গঠন করেছে। তারা নাকি পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার জন্য 'জিহাদ' করবে 'বিদেশি এজেন্ট' আর মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে। দেশের অবস্থা এখন থমথমে। বহু মানুষ নিজেদের ভিটেমাটি ফেলে দেশ ছাড়ছে। কেউ কেউ নিরাপদ এলাকায় আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটছে। শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষের জীবন বাঁচানোর সে-এক অবিরাম প্রাণান্তকর চেষ্টা। ভয় আর আতঙ্কের সাথে মানুষের নিত্য বসবাস। বাতাসে বারুদের গন্ধ। চারদিকে হিংস্র হায়েনার গর্জন, বিষাক্ত কালকেউটের ফোঁসফোঁসানি! এ অবস্থায় মানুষের জীবন নিয়েই টানাটানি; তো, এমন পরিবেশে পরীক্ষা না দিয়ে মেয়েটি ঠিক কাজই করেছে– এমনি নানা কথা ভাবতে ভাবতে তবিবর

খালু বাজারের দিকে যান।

সন্ধের পর-পর তবিবর খালু বাড়ি আসেন। তিনি সোজা বিলু আপার ঘরের দিকে এগিয়ে যান। বিলু আপা তার পড়ার টেবিলে বসে মওলানা আমিন উদ্দিন যশোরীর লেখা 'ইসলাম ও আমাদের মুক্তিযুদ্ধ' শিরোনামের একটা প্রবন্ধ তৃতীয় বারের মতো পড়ছে। এমন সময় খালু বিলু আপার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাক দেন– মা বিলু, ঘরে আছিস?

বিলু আপা বাবার গলা শুনে হাতের কাগজটা বালিশের নিচে রাখতে রাখতে বলে– আব্বা, আসো।

বাবা ঘরে ঢোকেন। বিলু আপা বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে– কী ব্যাপার, আব্বা? কিছু বলবা?

বাবা মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেন। তারপর বলেন– মাগো, দেশের অবস্থা তো সুবিধের মনে হচ্ছে না। কী যে হবে...! এ দিকে আবার বাড়ির অল্প দূরে রাজাকার বাহিনীর ক্যাম্প। ওই বাহিনীতে অনেক চোর-বদমাশও এসে জুটেছে। ওই বদমাশগুলো গ্রামের বেশকিছু মানুষকে মুক্তিবাহিনীর লোক সন্দেহে ধরে এনে গুলি করে মারছে। ওরা মানুষের বাড়িঘর লুট করছে। রাজাকারদের খাওয়ার জন্য গরু-ছাগলও ধরে আনছে। শুনলাম, দুই-এক জায়গায় মা-বোনদের ইজ্জতের উপরেও হামলা হয়েছে। আবার শুনলাম, মুক্তিবাহিনীর সাথে নাকি খানসেনা আর রাজাকাররা যুদ্ধ করছে। ওরা আরও কি করছে জানিস? মুখ দেখে দেখে 'ডান্ডি কার্ড' না কী একটা দিচ্ছে। যাদের কাছে ওই ডান্ডি কার্ড থাকবে, তারাই নাকি সাচ্চা পাকিস্তানি। আর যারা ডান্ডি কার্ড পাবে না, তারা সব শত্রু। গত ইলেকশনে যারা নৌকায় ভোট দিয়েছে তাদের সহজে ডান্ডি কার্ড দিচ্ছে না। অনেককে আবার ক্যাম্পে ধরে এনে মারপিটও করছে। মা রে, এহন কী হবেনে, সেই চিন্তা করছি। আমি আমার কথা ভাবছি না, তোকে নিয়েই আমার ভয়। মা রে, ওরা আরও কত রকম অকাম যে করবে, তার কি ঠিক আছে! তোর কী মনে হচ্ছে বল তো মা? আমার মাথা তো ঘুরে যাচ্ছে একেবারে!

বিলু আপা বাবার এতগুলো কথা শোনার পর তাঁর হাত ধরে বলে: আব্বা, দেশে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। মুক্তিযোদ্ধারা সারা দেশে হানাদার বাহিনী আর রাজাকারদের দারুণ ধোলাই দিচ্ছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবরে এসব কথা বলেছে। ওখানে 'চরমপত্র' নামে একটা অনুষ্ঠান হয়। ওই অনুষ্ঠানে চরমপত্রের পাঠক মুক্তিযুদ্ধের নানা খবর চমৎকার করে পরিবেশন করেন। এগুলো ভারি মজার। শুনবা একটা? আজই শুনলাম, চরমপত্র পাঠক বলছেন– আল্লারে আল্লা, আমাগো বিচ্ছুগো প্যাদানি খাইয়া মচুয়াগো অবস্থা এক্কেরে কেরাসিন অইয়া গ্যাছে গা!–এমনি আরও কত কথা, কত খবর! আব্বা শোনো, ওই বিচ্ছুরা হলো আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা দামাল ছেলেরা– মানুষ আদর করে, ভালোবেসে ওদের নাম দিয়েছে 'বিচ্ছু'। আর মচুয়া হলো বড়ো মোচওয়ালা হানাদার পাকিস্তানি সেনারা। আসলেই কিন্তু মুক্তিবাহিনীর হাতে ওই মচুয়া আর দেশীয় বেইমান রাজাকারেরা হেভি ধোলাই খাচ্ছে। তুমি দুশ্চিন্তা করবা এজন্য তোমাকে স্বাধীন বাংলা বেতারের কথা এতদিন বলিনি। যদি শুনতে চাও, আজই শুনতে পারবে। গ্রামে যাদের রেডিও আছে তারা সবাই গোপনে স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান শোনে। যাক, তুমি কোনো চিন্তা করবা না আব্বা। শুধু দোয়া করবা যেন মুক্তিযোদ্ধারা এই যুদ্ধে জয়ী হয়, আমাদের দেশটা যেন তাড়াতাড়ি স্বাধীন হয়। আর 'ডান্ডি কার্ডের' কথা বলছ? আব্বা, ওটা আসলে 'আইডেন্টিটি কার্ড' মানে পরিচয় পত্র। তা, ঝামেলা এড়ানোর জন্য একটা সংগ্রহ তো করতেই হবে। তুমি ওদের কাউকে বলো। তুমি বললে নিশ্চয়ই ওরা তোমাকে একটা 'ডান্ডি কার্ড' ম্যানেজ করে দেবে। তোমাদের মতো মানুষদের সাপোর্ট তারা নিতে চাইবে এ সময়।

খালু তবিবর মোল্লা খুব সাদাসিধে গোছের একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ। কারো সাথে কোনো ঝগড়া-ফ্যাসাদ নেই। মানুষের উপকার ছাড়া ক্ষতি করেন না কখনো। কিন্তু যত সাদাসিধে মানুষই তিনি হন না কেন, এ কথা তিনি ঠিই বুঝতে পারেন যে, মুক্তিযুদ্ধ আর মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপারে তাঁর মেয়ে কোনো আপোশ করবে না। কোনো বিরূপ কথা শুনতে চাইবে না। আসলে তিনিও তো তা চান না। কিন্তু

এখন সময় বড়ো খারাপ। তিনি বুড়ো মানুষ। ঘরে তরুণী মেয়ে। এ সময় জান ও মান-ইজ্জত বাঁচাতে হলে একটু সাবধান হয়ে চলতেই হবে।

বিলু আপার সব কথা শুনে তাই খালু একটু দ্বিধায় পড়ে যান। কারণ, দক্ষিণ-পাড়ার করিম মুন্সির কাছে তিনি সেদিন শুনেছেন– যারা মুক্তিযুদ্ধ করছে, তারা পাকিস্তান আর ইসলামের শত্রু। ওরা ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তান ভাঙতে চাচ্ছে। আর পাকিস্তান না থাকলে এ দেশে ইসলামও থাকবে না। যারা পাকিস্তান ভাঙার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করছে, তারা মুসলমানই না। তাই ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষার স্বার্থে পাকবাহিনী আর রাজাকারদের সাহায্য করা আমাদের সবার পবিত্র ইমানি দায়িত্ব।

করিম মুন্সি স্থানীয় রাজাকার ক্যাম্পের সহকারী কমান্ডার-কাম প্রচারক। বক্তা ভালো। সে গ্রামের মানুষের মধ্যে আরও প্রচার করে বেড়ায়– পাকিস্তান আর্মি হলো দুনিয়ার সেরা আর্মি। ওদের রাইফেল-কামান, প্লেন-ট্যাংক আর গোলাগুলির কী কোনো শুমার আছে! আর ওই যে ছেঁড়া প্যান্ট-লুঙ্গিপরা আর নাঙ্গা-পায়ের ছেলে-ছোকরার দল! ওরা নাকি মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে! আরে ব্যাটারা! তোদের আছে কী! বাঁশের লাঠি আর কয়টা পুরোনো রাইফেল–এই তো! এইসব দিয়ে কী দুনিয়ার সেরা আর্মির সাথে যুদ্ধ করা যায়? স্রেফ কচু-কাটা হয়ে যাবে সব! কথায় আছে না, পিঁপিলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে! বোকার বোকা, গাধার গাধা সব কয়টা! পিঁপিলিকার মতো ওদেরও মরার বড্ড ইচ্ছে হয়েছে! ভাইসব, আপনারা সবাই সাবধান থাকবেন। সবার আগে পাকিস্তান। তারপর আর সবকিছু। পাকিস্তানের জন্য আমাদের সর্বশক্তি কাজে লাগাতে হবে। জান-মাল কুরবানি করতে হবে। এটা সবার জন্য ফরজ। মনে রাখবেন: মরলে শহিদ বাঁচলে গাজি/ রাখতে হবে জীবনবাজি। পাকভূমি পাকিস্তানের জন্য/ জীবন দিয়ে হব মোরা ধন্য।

মুন্সির এসব কথা খালু তবিবর মোল্লাও শুনেছেন। তাঁর বার বার মনে পড়ে মুন্সির কথাগুলো। তিনি চিন্তা করেন, মুন্সি তো এলেমদার মানুষ। আর্মির ভেতরের খোঁজখবর রাখেন। তিনি কী আর বেঠিক কথা বলবেন! তার কথা অনুযায়ী, যদি মুক্তিযোদ্ধারা হেরে যায়, তাহলে কী সাংঘাতিক অবস্থা করবে পাকসেনা আর রাজাকারেরা! তা ছাড়া মুন্সি সাহেব বলেছেন– মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তান ও ইসলামের শত্রু। শুধু তাই না, মুক্তিযোদ্ধারা মুসলমানই না। এদিকে আবার তার মেয়ে বিলু বলছে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য দোয়া করতে। ব্যাপারটা তাঁর কাছে বড্ড খটোমটো লাগছে। তাই আমতা আমতা করে তিনি বলেন: মা রে, মুক্তিযোদ্ধারা কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে? এক মুসলমান আরেক মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়ছে, এটা কী ঠিক?

বিলু আপা তার বাবার কথা শুনে অবাক হয় না। ও জানে, গ্রামের সরল-সহজ অনেক সাধারণ মানুষের মধ্যেই এই ভুল ধারণাটি রয়েছে। আসলে তাদের বোঝানো হয়েছে: পাকিস্তান ও ইসলাম এক। ওই করিম মুন্সির মতো কিছু ধুরন্ধর মানুষই তাদের এই ভুল ধারণাটি দিয়েছে। আর গ্রামের সহজ-সরল সাধারণ মানুষগুলো তাদের কথা সত্য বলে ধরে নিয়েছে। অথচ তাদের এই ভুল ভাঙার জন্য উপযুক্ত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিলু আপা তাই ভাবে– তাদের এ ভুল ভাঙাতে হলে তাদের ইসলামি বিধানের আলোকেই বোঝাতে হবে। এ বিষয়ে তার যেটুকু পড়াশোনা আছে, আর মাওলানা যশোরীর প্রবন্ধ–এ দিয়েই বাবাকে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে। আর শুধু তার বাবাকে নয়, সুযোগমতো অন্যদেরও বোঝাতে হবে গোপনে। এ-ক্ষেত্রে তাদের গড়া নতুন সংগঠন 'ছাত্রী ব্রিগেড'-কেও কাজে লাগাতে হবে।

বিলু আপা কী-সব ভাবছে দেখে তবিবর মোল্লা বলেন: আমার কথার জবাব দিলি না যে মা? মনে হয় ফাঁপরে পড়ে গেছিস?

বাবার কথায় একটু রসিকতার ভাব ফুটে ওঠে। তবুও তা গায়ে না মেখে বিলু আপা বালিশের নিচে থেকে সেই কাগজটা বের করে। তারপর বলে– আব্বা, আমি এতক্ষণ ওই বিষয়টাই পড়ছিলাম এই কাগজটা থেকে। এখানে একটা প্রবন্ধ আছে। আমার বান্ধবী জেসমিন এটা আমাকে দিয়েছে। প্রবন্ধটির নাম 'ইসলাম ও আমাদের মুক্তিযুদ্ধ'। লেখক মাওলানা

আমিন উদ্দিন যশোরী। এর মধ্যে অনেক ভালো ভালো কথা আছে। কুরআন-হাদিসের উদ্ধৃতি আছে। এটা পড়লে বোঝা যায়, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধারা কখনই ইসলাম-বিরোধী না, বরং মুক্তিযোদ্ধারাই সঠিক পথে আছে। তুমি তো লেখাপড়া জানো। আমি এই প্রবন্ধটা তোমাকে দেব। তুমি রাতে ভালো করে এটা পড়বা। তারপর কাল তোমার সাথে এ নিয়ে বিস্তারিত কথা বলব। তবে আজ আমি খুব সাধারণ কয়েকটা বিষয় নিয়ে তোমার সাথে আলোচনা করতে চাই। আচ্ছা আব্বা, ওই যে তুমি বললে রাজাকার বাহিনীতে অনেক চোর-বদমাশ ঢুকেছে। এজন্য তোমাকে বেশ চিন্তিতও মনে হলো। তো, চোর-বদমাশ দিয়ে কীভাবে ইসলাম রক্ষা হবে? মানুষের উপকার হবে? খারাপ মানুষ দিয়ে কি কোনোদিন ভালো কাজ হয়?

–তোর এই কথাটা একদম ঠিক। আমাদের এখানকার রাজাকার বাহিনীতে অনেকগুলো দাগি চোর আর বজ্জাত ধরনের মানুষ যোগ দিয়েছে। ওরা সত্যিই ভালো কিছু করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু এখানকার কমান্ডার রশিদ মাস্টারকে তো ভালো মানুষ বলেই জানতাম। তাছাড়া, ডেপুটি কমান্ডার খবির ডাক্তার এবং আরও কয়েকজন আছে তার মতো। তারা কেন যে ওই শয়তানগুলোরে জা'গা দেছে, বুঝতে পারছি নে।–এ পর্যন্ত বলে তিনি বিলু আপার দিকে তাকান আরও কিছু শোনার জন্য। তাঁকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে।

বিলু আপা বুঝতে পারে, তার যুক্তিগুলো বাবার মনে ধরতে শুরু করেছে। কিন্তু পুরোপুরি দ্বিধা কাটছে না তার। সে তাই আবার বলে– আব্বা, আরেকটা কথা। বঙ্গবন্ধুর দল গত নির্বাচনে জিতেছে, ঠিক তো? তুমি নৌকায় ভোট দিয়েছিলে। ভোট দিয়ে এসে বলেছিলে, মুজিবররে ভোট দিয়ে আসলাম, ঠিক তো?

বাবা সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বলেন: হ্যাঁ, ঠিক। দেশের বেশিরভাগ মানুষ দিয়েছিল, তাতে কী...

–তাতে অনেক কিছু, আব্বা। এবার তাহলে বলো, নির্বাচনে জেতার পরও বিজয়ী দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলো না কেন? এটা কি ঠিক? এটা অন্যায় না? ধর্ম-বিরোধী না?– বিলু আপার গলা একটু কঠিন শোনায়।

সে আবার বলে–আরেকটা কথা আব্বা। আমাদের ধর্মে আছে– কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, জুলুম-অত্যাচার করা, মুসলমান-মুসলমানে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া কবীরা গোনাহ্ অর্থাৎ অত্যন্ত কঠিন অপরাধ। তো, তুমি বলো, কারা আগে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে? কারা আগে আক্রমণ করেছে? কারা জুলুম-অত্যাচার করছে? কারা অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করছে, মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে– বাঙালিরা, না পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী? আমরা সবাই জানি, পঁচিশে মার্চের কালরাতে হানাদার বাহিনীই প্রথম নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর হিংস্র হায়েনার মতো হামলা চালায়। তারাই প্রথম যুদ্ধ শুরু করে। বহু নিরীহ মানুষকে তারা হত্যা করে, এখনও করছে। এর জবাব দিতে গিয়ে আত্মরক্ষার জন্য অত্যন্ত ন্যায্যভাবে বাঙালিরা অস্ত্র হাতে নেয়। স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তা' না হলে তো বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে 'এবারের সংগ্রাম–আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম–স্বাধীনতার সংগ্রাম' কথাটি বলার পরই সবাই হানাদারদের আক্রমণ করত, কিন্তু তা কি করেছে? তাহলে বলো, কারা অক্রমণকারী? কারা অন্যায় করেছে? কারা অত্যাচারী, জালিম? কারা ইসলাম-বিরোধী কাজ করেছে? এরপর তুমিই চিন্তা করে দেখ, মুক্তিযোদ্ধারা ইসলামের শত্রু, না পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আর তাদের দোসর-দালালেরা?

বিলু আপা রীতিমতো একটা ওজনদার লেকচার ঝেড়ে দেয় বাবার সামনে। বাবা বিলুর এতগুলো জোরালো 'কেন'-র জবাবে মিন মিন করে কী যেন বলেন, বোঝা যায় না। তবে মেয়ের কথাগুলো যে তাঁর পছন্দ হয়েছে, তাঁর মুখ দেখে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। মেয়ের প্রশ্নের তোড়ে তাঁকে বেশ নার্ভাস লাগে। বিলু আপা তাই বাবাকে স্বাভাবিক করার জন্য মিষ্টি করে বলে– আব্বা, তুমি কি এখন এক কাপ চা খাবা? আমি বানিয়ে আনি? তুমি ততক্ষণ এই কাগজটায় একটু চোখ বোলাতে থাকো।

বিলু আপা চা বানাতে রান্নাঘরের দিকে যায়। খালু তবিবর মোল্লা কিন্তু কাগজ পড়েন না। তাঁর চোখভরা পানি। একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে নিজে-নিজেই বলেন– আল্লাহ! আমার এই মা-মরা মেয়েটাকে তুমি ভালো রেখ! দেশের এই দুর্দিনে তার যেন কোনো বিপদ না হয়। ওর মা বেঁচে থাকলে আমার অত চিন্তা করতে হতো না। সে-ই সব সামলে নিতো। কিন্তু এখন তো সব চিন্তা আমার একারই করতে হচ্ছে।... আসলে মেয়েটা আমার কত্ত বড়ো হয়েছে! কত্ত জ্ঞানের কথা বলল! ওর কাছ থেকে আরও অনেক কথা শুনতে হবে। পাকা একজন মওলানার মতো কথা বলছে যেন।...

খালুর মুখে খুশির হাসি ঝিলিক দেয়। পাঞ্জাবির হাতার কোনা দিয়ে চোখের পানি মুছে কাগজটা হাতে নেন। এ সময় ট্রের ওপর দু কাপ চা আর কিছু বিস্কুট নিয়ে বিলু আপা ঘরে ঢোকে। টেবিলের ওপর ট্রে রেখে বলে– আব্বা, বিস্কুট আর চা খাও। তা কই, কাগজটায় একটু চোখ বুলিয়েছ তো?

খালু চা-বিস্কুট খেতে খেতে বলেন–না রে মা, এখনও পড়িনি। আসলে তুই যে কথাগুলো বললি, তা নিয়েই ভাবছিলাম। কী চমৎকার জ্ঞানের কথা! যুক্তির কথা! এ রকম আরও কথা শুনতে চাই। জানতে চাই। আমার ঘরে এত বড়ো বিদ্বান মানুষ থাকতে আমি খালি করিম মুন্সির কথার ঝাল খাবো ক্যান?–এই বলে বাবা বিলু আপার হাত ধরে হাসতে থাকেন। বড়ো সুন্দর আর পবিত্র সে-হাসি!■ *[চলবে...]*

শিশুসাহিত্যিক

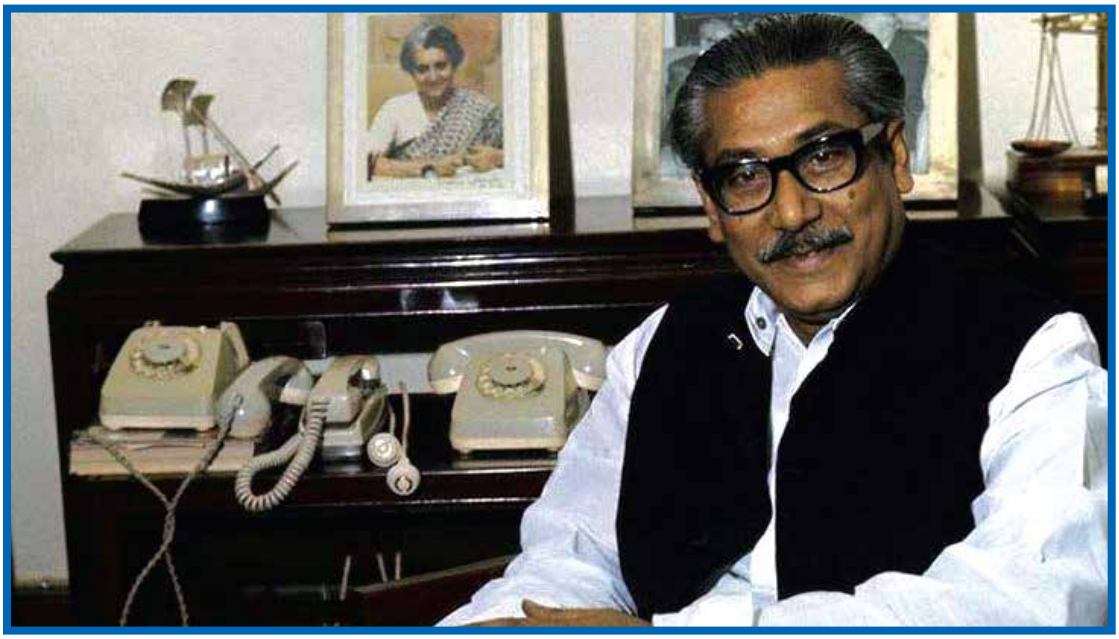

সে...ই টেলিফোন

সাঈদুল ইসলাম

'তখন ঢাকায় এত রাস্তাঘাট ও গাড়িঘোড়া ছিল না। সবাই পায়ে হেঁটে ৩২ নম্বরে গিয়ে নেতার সঙ্গে দেখা করতেন। যেতে না পারলে পঁচিশ একষট্টি নম্বরে [২৫৬১] ডায়াল ঘুড়িয়ে কথা বলে নিতাম। বাসায় থাকলে বঙ্গবন্ধু নিজেই ফোন তুলতেন।' বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক মগবাজারের আকতার সর্দার মৃত্যুর কয়েক বছর আগের স্মৃতিকথায় ভেসে উঠেছিল এমন কিছু কথা।

আমরা বিভিন্ন আলোকচিত্রে বঙ্গবন্ধুকে ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে বসে ল্যান্ডফোনে কথা বলতে দেখা যায়। কখনো বা সদা হাসোজ্জ্বল বঙ্গবন্ধুর পাশে দেখা যায় ল্যান্ডফোন। ওই টেলিফোনের নম্বর কত ছিল? তোমরা কেউ বলতে না পারলেও চার অঙ্কের এই ফোন নম্বর সেই সময়কার রাজনৈতিক নেতাকর্মী, পুলিশ, সাংবাদিক এবং প্রশাসনের মুখস্ত ছিল। নম্বরটি ছিল ২৫৬১।

একটিই ফোন ছিল বঙ্গবন্ধুর বাসায়। দেশের নির্বাহী প্রধান হওয়ার পরেও নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া সৌখিনতা করে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা কিছু করতেন না। ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে আসার পর এই ল্যান্ডফোন নেয়া হয়। তার আগে বঙ্গবন্ধুর নামে আর কোনো টেলিফোন বরাদ্দ ছিল না। ষাটের দশকে এ বাড়ি বানানোর পর নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু হিসেবে তিনি টেলিফোনের সংযোগ দিয়েছিলেন।

সহজ যোগাযোগের জন্য টেলিফোনটি রাখা হলেও বঙ্গবন্ধুর জীবনে অনেক সময় তা বিপদ ডেকে আনত। পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনের মূল টার্গেট ছিল বঙ্গবন্ধুর ফোনটি। তারা ২৪ ঘণ্টাই আড়ি পেতে শোনার চেষ্টা করত ফোনে বঙ্গবন্ধু কী কথা বলেন। তাঁর কাছে কারা কারা ফোন করেন এবং কী কথা হয় সেটা গোয়েন্দারা রেকর্ড করত।

১৯৬১ সালের ১লা অক্টোবর এ বাড়িতে ওঠার পর

থেকেই বঙ্গবন্ধুর সবকিছু গোয়েন্দা তদারকিতে চলে আসে। চৌকষ বঙ্গবন্ধু তাই বিভিন্ন সহকর্মী, রাজনৈতিক নেতা এবং ছাত্রনেতাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার সময় ছদ্মনাম এবং সাংকেতিক (কোডেড) শব্দ ব্যবহার করতেন, যাতে গোয়েন্দারা কথাবার্তা বুঝতে না পারে। যেমন: ফজলুল হক মনি ফোনে বঙ্গবন্ধুর কাছে নিজেকে 'বালুওয়ালা' বলে পরিচয় দিতেন। আবার সিরাজুল আলম খান ফোনে বঙ্গবন্ধুকে 'ইটাওয়ালা' হিসেবে পরিচয় দিতেন। এ পরিচয় শুনতে পেয়ে গোয়েন্দারা আড়িপাতা বন্ধ করে দিত।

বঙ্গবন্ধুর ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবনে ৩২ নম্বর বাড়ির টিঅ্যান্ডটি ফোনটি অনেক কিছুর সাক্ষী। এমনকি বঙ্গবন্ধুর শেষ বিদায়েরও। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভোরবেলায় একদল বিপথগামী সেনা অফিসার ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে আক্রমণ চালালে সেই ফোনটি হয়ে ওঠে বঙ্গবন্ধুর শেষ ভরসাস্থল। বঙ্গবন্ধু তখন ফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ করেছিলেন।

এর সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় বঙ্গবন্ধুর রেসিডেন্ট পিএ ও হত্যা মামলার বাদী আ ফ ম মোহিতুল ইসলামের বর্ণনায়। তার বর্ণনা অনুযায়ী, ১৪ই আগস্ট রাত ৮টা থেকে ১৫ আগস্ট সকাল ৮টা পর্যন্ত তিনি ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে দায়িত্বরত ছিলেন। হঠাৎ করে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। এরপর টেলিফোন মিস্ত্রির ডাকে তার ঘুম ভেঙে যায়। মিস্ত্রি বলেন, প্রেসিডেন্ট সাহেব আপনাকে ডাকছেন। তখন সময় ভোর ৪টা কি ৫টা হবে। বঙ্গবন্ধু তাকে বলেন, সেরনিয়াবাতের বাসায় দুষ্কৃতকারীরা আক্রমণ করেছে। এ কথা শুনে তিনি (মোহিতুল) ওই ফোন থেকে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন করেন। অনেক চেষ্টার পরও লাইন পাচ্ছিলেন না। এরপর গণভবন এক্সচেঞ্জে লাইন লাগানোর চেষ্টা করেন। ফোন ধরে 'হ্যালো হ্যালো' বলে চিৎকার করা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু নিচে এসে তার হাত থেকে রিসিভার নিয়ে বললেন, 'আমি প্রেসিডেন্ট বলছি'।

ঠিক তখনই দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়ে একঝাঁক গুলি এসে কক্ষের দেওয়ালে লাগে। গুলির শব্দে তারা শুয়ে পড়েন মেঝেতে। কিছুক্ষণের জন্য গুলির শব্দ বন্ধ হলে বঙ্গবন্ধু নিচ থেকে উপরে উঠে যান। এর মধ্যে আবার গোলাগুলি শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু তখন তার সেই ফোন নিয়ে ব্যস্ত। ফোনে তিনি তার সামরিক সচিব কর্নেল জামিলকে বলেন, 'জামিল তুমি তাড়াতাড়ি আসো। আর্মির লোকজন আমার বাসা অ্যাটাক করেছে। সফিউল্ল্যাহকে ফোর্স পাঠাতে বলো।'

সেই ফোন থেকে এরপর সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহকে ফোন করেন বঙ্গবন্ধু। বলেন 'শফিউল্লাহ, তোমার ফোর্স আমার বাড়ি অ্যাটাক করেছে। কামালকে বোধ হয় মেরে ফেলেছে। তুমি জলদি ফোর্স পাঠাও।'

ফোনের ওপাশ থেকে শফিউল্লাহ বলেছিলেন 'আই অ্যাম ডুয়িং সামথিং, ক্যান ইউ গেট আউট?' জেনারেল সফিউল্লাহ সেদিন আর ৩২ নম্বরমুখী হননি।

বঙ্গবন্ধুকে বাঁচাতে এসে প্রাণ দেন কর্নেল জামিল। খুনিচক্র সপরিবারে হত্যা করে বঙ্গবন্ধুকে। বিশাল দেহের মানুষ শেখ মুজিবের রক্তাক্ত লাশ পড়ে থাকে সিঁড়ির উপর। সে...ই টেলিফোনের খু..ব কাছে। ■

শিক্ষার্থী, ইউল্যাব ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

বঙ্গবন্ধু রেল জাদুঘর

সুমন প্রামানিক

দেশে প্রথম ভ্রাম্যমাণ বঙ্গবন্ধু জাদুঘর তৈরি করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। ট্রেনের দুটি বগিকে রূপান্তরিত করা হয়েছে ডিজিটাল জাদুঘরে। আলো ঝলমলে নান্দনিক ও আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন কক্ষটিকে উন্নত প্রযুক্তি আর মনোরম কারুকাজে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনালেখ্য। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষের দেয়ালজুড়ে ১২টি মনিটর, এতে রয়েছে জাতির পিতার ভিন্ন ভিন্ন সময়ের প্রামাণ্যচিত্র। এই মনিটরে চাপ দিলেই ভেসে উঠছে মহানায়কের কাব্যিক জীবনের গল্প।

দুটি বগিতে শৈশব থেকে শুরু করে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী ভূমিকা ডিজিটাল শিল্পকর্মে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া দেয়াল জুড়ে টাঙানো হয়েছে বঙ্গবন্ধুর দুর্লভ সব ছবি, আছে বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত চশমা, প্রিয় তামাক পাইপ আর মুজিব কোটের প্রতিরূপও। বঙ্গবন্ধুর হাতে লেখা চিঠি আর বইও শোভা পাচ্ছে এই জাদুঘরে। এতে দেশে-বিদেশে দেয়া বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ভাষণ সংরক্ষণ করা হয়েছে। ১৯২০ থেকে ১৯৭৫-ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ের যেন জীবন্ত প্রামাণ্য দলিল এই জাদুঘর।

২৭শে এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে জাদুঘরটির উদ্‌বোধন করেন। কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজনসহ মন্ত্রণালয় ও রেলপথ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতি সপ্তাহে দেশের বিভিন্ন রেল স্টেশনে জনসাধারণের জন্য বিনামূল্যে উন্মুক্ত রাখা হবে এটি। এরই মধ্যে ঢাকা থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত রেল জাদুঘরটির ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে। দুটি কোচের একটি থাকবে দেশের পূর্বাঞ্চলে অন্যটি থাকবে পশ্চিমাঞ্চলের রেলস্টেশনে। প্রথমে মিটার গেজ শুরু হয় চট্টগ্রাম স্টেশন থেকে আর ব্রডগেজ শুরু হয় গোপালগঞ্জ স্টেশন থেকে। জাদুঘরটি কোন রেল স্টেশনে কত দিন থাকবে তার একটি শিডিউল প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। ■

সম্পাদক ও প্রকাশক, দি ভয়েস অব এশিয়া পত্রিকা

মুখোমুখি বাবা ও ছেলে

ইমরুল ইউসুফ

ছোটোবেলা থেকেই বাবা শেখ লুৎফর রহমানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। একসাথে বসে গল্প করতেন। পড়াশোনা ও চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। খেলাধুলা করতেন। বাবাকে ভীষণ ভালোবাসতেন তিনি। সেসব কথা প্রকাশ পেয়েছে বঙ্গবন্ধুর মুখেই। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* বইয়ের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'আমি বংশের বড় ছেলে। তাই সমস্ত আদর আমারই ছিল।' তবে তিনি বাবাকে ভয়ও পেতেন। বঙ্গবন্ধু ওই বইয়ের আরেক জায়গায় লিখেছেন, 'আমার আব্বা মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন। কারণ ছোটো শহর, নালিশ হতো, আমার আব্বাকে আমি খুব ভয় করতাম।' ...'আমি ভীষণ একগুঁয়ে ছিলাম। আমার একটা দল ছিল। কেউ কিছু বললে আর রক্ষা ছিল না। মারপিট করতাম। আমার দলের ছেলেদের কেউ কিছু বললে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়তাম।' বাবা মনে কষ্ট পাবেন এমন কথা বঙ্গবন্ধু কখনো বলতেন না। এমন কাজ করতেন না। বাবা-মাকে অসম্মান করে কথা বলতেন না। বরং সবসময় কাছে কাছে থাকতেন। বিপদে-আপদে বাবার পরামর্শ নিতেন। তবে খেলার মাঠে বঙ্গবন্ধুর আচরণ ছিল একজন পেশাদার ফুটবলারের মতো। এজন্য তিনি খেলার মাঠে তাঁর বাবাকে বা বাবার দলকে এতটুকুও ছাড় দিতেন না।

ছোটোবেলা থেকেই শেখ মুজিব ছিলেন ডানপিটে স্বভাবের। ছিলেন স্বাধীনচেতা, দুরন্ত এবং সাহসী। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, সত্য ও উচিত কথা বলার সাহস থাকায় কারো সামনেই তিনি কথা বলতে ভয় পেতেন না। সে খেলার সাথি, সহপাঠী অথবা স্কুলের শিক্ষকই হোক। গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন গিরীশ বাবু। সাহসিকতা ও স্পষ্টবাদিতার জন্য তিনি কিশোর মুজিবকে খুব পছন্দ করতেন। মিশন স্কুলে ভর্তি হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ সহপাঠী ও ছোটোদের মন জয় করে নিলেন তিনি। হয়ে উঠলেন সবার 'মুজিব' কিংবা 'মুজিব ভাই'। কেউ আবার বলত 'মিয়া ভাই'। স্কুলের যে-কোনো উৎসব, অনুষ্ঠান, খেলাধুলায় মিয়া ভাইয়ের থাকত সক্রিয় ভূমিকা। যে-কোনো কাজে মুজিব এগিয়ে গেলে অন্য ছাত্ররাও তাঁর সঙ্গে এগিয়ে যেত স্বতঃস্ফূর্তভাবে। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে ছাত্রদের কোনো আবদার, আবেদন, দাবি বা অভিযোগের ক্ষেত্রে আগে এগিয়ে যেতেন কিশোর মুজিব।

গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে পড়ার সময় ফুটবল মাঠ দাপিয়ে বেড়াতেন বঙ্গবন্ধু। খেলতেন ভলিবল, হাডুডু, বাস্কেটবল। ছিলেন মিশন স্কুলের ফুটবল অধিনায়ক। হাডুডু খেলতে যেতেন বরিশাল আর যশোরে। সব খেলাতেই খোকা সেরা। বাবা শেখ লুৎফর রহমানও এলাকার নামকরা ফুটবলার। যে কোনো খেলার টিমে মুজিব থাকা মানেই জিত। তবে দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার কারণে বাবা তাকে বেশি খেলতে দিতে চাইতেন না। বঙ্গবন্ধু তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* বইয়ে লিখেছেন– 'ছোট সময়ে আমি খুব দুষ্ট প্রকৃতির ছিলাম। খেলাধুলা করতাম, গান গাইতাম...। সেবা সমিতির কাজ করতাম। ...ফুটবল, ভলিবল খেলতাম। খুব ভাল খেলোয়াড় ছিলাম না। তবুও স্কুলের টিমের মধ্যে (আমার) ভাল অবস্থান ছিল।' এ প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন– 'খেলাধুলার দিকে আমার খুব ঝোঁক ছিল। আব্বা আমাকে বেশি খেলতে দিতে চাইতেন না। কারণ আমার হার্টের ব্যারাম হয়েছিল। আমার আব্বাও ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি অফিসার্স ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলেন। আর আমি মিশন স্কুলের ক্যাপ্টেন ছিলাম। আব্বার টিম ও আমার টিমে যখন খেলা হত তখন জনসাধারণ খুব উপভোগ করত। আমাদের স্কুল টিম খুব ভাল ছিল। মহকুমায় যারা ভাল খেলোয়াড় ছিল, তাদের এনে ভর্তি করতাম এবং বেতন ফ্রি করে দিতাম।'

কিশোর মুজিব মিশন স্কুলের হয়ে বাবার অফিসার্স ক্লাবের বিপক্ষে খেলেছেন বেশ কয়েকটি ফুটবল ম্যাচ। যা এলাকার মানুষের জন্য ছিল খুবই উপভোগ্য। যেদিন পিতা-পুত্র দুই দলের ফুটবল ম্যাচ থাকত সেদিন দর্শকে মাঠ ভরে যেত। কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যেত মাঠের সব প্রান্তর। খোকার টিমের সবাই ছাত্র। খোকার বাবার টিমের প্রায় সব খেলোয়াড় চাকুরিজীবী। ভাড়া করা বাইরের খেলোয়াড়ও আছে বাবার টিমে। ওই ক্লাবের যেমন টাকা আছে। ভালো কোচও আছে। কিন্তু খোকার টিমে নির্দিষ্ট কোনো কোচ নেই। খোকাই তাদের নিয়মিত প্র্যাকটিস করায়। খোকা থাকে গোলরক্ষক। তাঁর দৈহিক উচ্চতা এ কাজে সহায়ক হয়। যে ধরনের কিকই হোক– খোকা সহজেই সামলে নেয়, লুফে নেয়। অপরদিকে বাবা শেখ লুৎফর রহমান গোপালগঞ্জ অফিসার্স ক্লাবের সেক্রেটারি। কিন্তু বাবার টিম বরাবরই খোকার টিমের কাছে হেরে যায়। ১৯৪০ সালে অনেকবার এ দুটি টিমের লড়াই হয়। সে বছর একটি খেলাতেও বাবার টিম জিততে পারেনি। খোকার ইচ্ছে হয়– একটা অন্তত খেলায় বাবার দল জিতুক। কিন্তু দলকে খেলতে তো হবে। এগারোজন খেলোয়াড়। কেউ তো ছাড় দিতে রাজি নয়।

শেখ মুজিবুর রহমানের টিমের দশজন খেলোয়াড় প্রাণশক্তি দিয়ে মাঠ আগলে রাখে। খোকা আগলে রাখে গোলপোস্ট। মাঠের ছেলেরা বল ঢুকিয়ে দেয় তাঁর বাবার ক্লাবের জালে। শুরু হয় হই হই, রই রই। হিপ হিপ হুররে। সে বছর পরপর পাঁচবার এই দুই টিমের খেলা ড্র হয়েছিল। এই পাঁচবারই অফিসার্স ক্লাবের টিমে ভাড়া করা খেলোয়াড়রা খেলেছিল। তাই বাবার ইচ্ছে কোনো বাইরের খেলোয়াড় তাঁর দলে আর রাখবেন না। অনেক টাকা

খরচ হয় তাদের পিছনে। এজন্য তিনি সংকল্প করলেন ভাড়াটে খেলোয়াড় না নিয়ে নিজেদের যারা আছে, তাদের নিয়েই এবার খেলতে হবে। খোকার টিমের সঙ্গে জিততেই হবে।

খোকার কাছে খেলার প্রস্তাব গেল। খোকা রাজি হলো না। কারণ একটানা খেলতে খেলতে তাঁর টিমের সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। খোকার শরীরও ভালো যাচ্ছে না। আবার সামনে পরীক্ষা। পড়ারও চাপ আছে। এসব কথা চিন্তা করে খোকা রাজি হলো না। বাবা ব্যাপারটি নিয়ে ভাবলেন। তিনি তাঁর ক্লাবের কর্মকর্তাদের খোকার সমস্যার কথা জানালেন। খেলা সম্ভব নয়। বাবা ও ছেলেকে রাজি করাতে গোপালগঞ্জ ফুটবল ক্লাবের সেক্রেটারিকে দায়িত্ব দেওয়া হলো। তিনি একবার খোকার কাছে যান। আরেকবার যান খোকার বাবার কাছে। অনুরোধ করেন তাঁরা যাতে খেলায় অংশ নেন। শেষে কেউই রাজি হলো না দেখে তিনি বললেন, এটা ওদের বাপ-ছেলের ব্যাপার। আমি আর এ ব্যাপারে হাঁটাহাঁটি করতে পারছি না। অবশেষে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের হেডমাস্টার রসরঞ্জন সেনগুপ্তের কথা রক্ষা করতে হলো। এ জেড খান শিল্ডের ফাইনাল খেলা। নির্ধারিত দিনে খেলা হলো। এই খেলায় এক গোলে হার মানতে হলো ছেলেকে। কোনো খেলায় এই প্রথম বাবা শেখ লুৎফর রহমান জয় পেলেন।

ছোটোবেলা থেকেই খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ থাকার কারণে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর ক্রীড়াঙ্গন নতুন করে সাজানোর চেষ্টা করেন। তাঁর প্রিয় খেলা হাডুডু বা কাবাডিকে জাতীয় খেলার মর্যাদা দেন। ১৯৭২ সালে তিনি গঠন করেন 'বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রক সংস্থা'। যা বর্তমানে 'জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ' নামে পরিচিত। দেশের সব ক্রীড়া সংস্থাই এর অধীনে। একই বছর প্রতিষ্ঠা করেন দেশের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা 'বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড'। যে প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান নাম 'বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড'। ফুটবলের উন্নয়নে তিনি ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন'। সে সময় একে একে গড়ে ওঠে সাঁতার, হকি, ভলিবল, অ্যাথলেটিকস, টেনিস ইত্যাদি ফেডারেশন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই নিবেদিত ক্রীড়া সংগঠকরা এসব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নেন গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে।

স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে ঢাকা স্টেডিয়ামে (বর্তমান বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম) অনুষ্ঠিত

হয়েছিল মুজিবনগর একাদশ ও প্রেসিডেন্ট একাদশের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। বঙ্গবন্ধু গ্যালারিতে বসে দেখেছিলেন নিজ দলের ২-০ গোলের হার! তবে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন দুই দলের খেলোয়াড়দের। শুধু তাই নয়। ১৯৭২ সালে কলকাতার মোহনবাগান আর ১৯৭৩ সালে রাশিয়ার মিন্সক ডায়নামো ক্লাব খেলতে আসে ঢাকায়। হাজারো কাজ বাদ দিয়ে বঙ্গবন্ধু দুটি ম্যাচই উপভোগ করেন গ্যালারিতে বসে। ফুটবলে বা অন্য কোনো খেলায় ভালো করলে সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশকে সবাই সমীহ করবে– এটা তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি সব সময় বলতেন, 'খেলা আর রাজনীতিকে আলাদা রাখতে হবে।' এজন্য ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর বড়ো ছেলে শেখ কামাল যখন আবাহনী ক্লাব গড়ে তুলছিলেন, তখন তাঁর কড়া নির্দেশ ছিল– 'রাজনীতিবিদদের ক্লাবের সঙ্গে জড়িত রাখবে না।'

ওই সময় ক্রিকেট সামগ্রীর কর ছিল ১৩০ শতাংশ। এ নিয়ে ক্রীড়া সংগঠকরা বঙ্গবন্ধুর কাছে গেলে তিনি করের অঙ্ক কমাতে অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে নির্দেশ দেন। অলিম্পিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিকে পর্যবেক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছিলেন বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রক সংস্থার আহ্বায়ক কাজী আনিসুর রহমানকে। ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিখিল ভারত গ্রামীণ ক্রীড়ায় অংশ নিতে নয়াদিল্লিতে পাঠিয়েছিলেন তখনকার মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকা লুত্‌ফুন নেসা বকুলের নেতৃত্বে একটি দল।

ক্রীড়াঙ্গনে অবদান রাখা খেলোয়াড় ও তাঁদের পরিবারের সাহায্যের জন্য ১৯৭৪ সালের ৬ই আগস্ট 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন করেন বঙ্গবন্ধু। খেলাধুলার প্রতি ভালোবাসা থেকেই তিনি দীর্ঘদিন জড়িয়ে ছিলেন ঐতিহ্যবাহী ঢাকা ওয়ান্ডারার্সের সঙ্গে। এ থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি শেখ পরিবারের তিন প্রজন্ম অর্থাৎ শেখ লুৎফর রহমান, শেখ মুজিবুর রহমান এবং শেখ কামাল সরাসরি খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। খেলাধুলার প্রতি তাঁদের ছিল অগাধ ভালোবাসা। ■

শিশু সাহিত্যিক ও উপপরিচালক, বাংলা একাডেমি

মুজিব মানে

নওশিনা ইসলাম

মুজিব মানে বাংলাদেশ
মুজিব স্বাধীনতা,
মুজিব মানে সূর্যোদয়
মুজিব জাতির পিতা।
মুজিব মানে মুক্ত আকাশ
মুজিব সোনার ধান,
মুজিব মানে শাপলা-গোলাপ
মুজিব পাখির গান।
মুজিব মানে প্রতিবাদী
মুজিব সবুজ ঘাস,
মুজিব মানে নতুন কিছু
মুজিব বিশ্বাস।

দ্বাদশ শ্রেণি, উল্লাপাড়া বিজ্ঞান কলেজ, সিরাজগঞ্জ

বাংলার বন্ধু

আবরার হামিদ

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সাহসী এক বাঙালি তরুণ,
বজ্রকণ্ঠ আর দরদ ছিল তাঁর বড়ো গুণ।
দেশবাসীর অধিকারে তিনি ছিলেন সদা সোচ্চার,
অত্যাচারীর খড়্গ ঠেকাতে গিয়েছেন জেলে বার বার।
বাঙালির স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার তরে
কুণ্ঠিত বোধ করেননি গলা রজ্জুবদ্ধ করে।
তাঁরই অশেষ নেতৃত্বে স্বাধীন হলো বাংলা,
শুরু হলো সামনের দিকে এগিয়ে পথ চলা।
চেয়েছিলেন দেশকে দেখতে ধরণীর উচ্চস্তরে,
নেতৃত্ব আর পরিশ্রমকে সংযোজিত করে।
আঁধার রাতে কতিপয় নির্লজ্জ কাপুরুষের দল,
ছিনিয়ে নিল প্রাণ বীরপুরুষের, দেশ হলো অচল।
তবুও তারা পারেনি ঠেকাতে বাংলার অগ্রগতি,
এখনো বাংলা চলছে সে পথে, যে পথে উন্নতি।
যখন রূপসি বাংলায় স্বাধীন সূর্য পুবাকাশে উঁকি মারে,
সোনার বাংলার বন্ধু মুজিব- তোমাকেই মনে পড়ে।

দ্বাদশ শ্রেণি, নটর ডেম কলেজ, ঢাকা

হে জাতির পিতা

মো. মোস্তাকিম হোসাইন মৃদুল

হে জাতির পিতা
তুমি আছো আজও আমার হৃদয়ে।
শুনেছি তোমার বীরত্বের শত গল্প
সেই থেকে সাধ জেগেছে আমরা হবো তোমারই মতো।
তুমি তো ছিলে এই বাংলার শ্রেষ্ঠ বীর।
তুমি তো ছিলে এই বাঙালির বন্ধু।
তাই তুমি আজও বাঙালির হৃদয়ে বেঁচে আছো বঙ্গবন্ধু।
বাঙালি আজ গর্বিত তোমারই জন্য।
তুমি তো করেছ প্রমাণ বাঙালি বীরের জাতি।
তুমিই তো করেছ প্রমাণ বাঙালি স্বাধীন জাতি।
যতকাল রবে বাঙালির মুখে বাংলা ভাষা,
ততকাল তুমি থাকবে বেঁচে বাঙালির হৃদয়ে,
হে জাতির পিতা।

দশম শ্রেণি, জগদল দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, পঞ্চগড়

বঙ্গবন্ধু

নিষাদ আলম

স্বাধীনতা দিয়ে বঙ্গবন্ধু
হয়েছেন সবার মিতা
তিনি সকলের আপনজন
আমাদের জাতির পিতা।

বাংলার স্বপ্ন সারথি
তিনি বাংলার প্রাণ
তাঁর কারণেই গাইতে পারি
সোনার বাংলার গান।

সবার মাঝে বঙ্গবন্ধু
থাকবেন অমলিন
শোধ হবে না কোনো
তাঁর কাছে আমাদের ঋণ।

অষ্টম শ্রেণি, সাভার উচ্চ বিদ্যালয়, সাভার

মুজিব

রাকিবুল হাসান

মুজিব মানে স্বাধীনচেতা
মুজিব মানেই জয়
মুজিব মানে হানাদারের
কলজে কাঁপা ভয়।

মুজিব মানে স্বাধীন দেশের
দক্ষ কারিগর
মুজিব মানে গৃহহীনের
নতুন বাড়িঘর ।

নবম শ্রেণি, পুখুরী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজশাহী

সোনার বাংলাদেশ

অর্থি বড়ুয়া

আমার দেশ, তোমার দেশ
শস্যশ্যামল বাংলাদেশ

ছয় ঋতু মাখামাখি
বদলে যায় রাতারাতি

সেথায় পাখি ডাকে সুরে
মাঝি গায় গান মন খুলে

নদী চলে আঁকাবাঁকা
কখনো জোয়ার কখনো ভাটা

কিষান-কিষানী ধরে হাল
জেলে বিছায় জাল

আঁকা ছবির দেশ
সোনার বাংলাদেশ।

অষ্টম শ্রেণি, কদমতলা হাই স্কুল, কদমতলা

চলো যাই জাতির পিতার সমাধি

হাবিবা আক্তার

ঢাকাকে যদি কেন্দ্র ভাবো তাহলে ঢাকার গুলিস্থানের ফুলবাড়িয়া অথবা সায়দাবাদ বাস কাউন্টার থেকে গোপালগঞ্জ যাওয়ার বেশ কয়েকটি ভালো পরিবহণ আছে। তারমধ্যে ইমাদ পরিবহণ, টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেস, গ্রীন লাইন, সোহাগ পরিবহণসহ বেশ কিছু জনপ্রিয় পরিবহণ রয়েছে। এর একটাতে টিকিট কেটে নিলেই হলো।

অপূর্ব সুন্দর দেশের বঙ্গবন্ধু এক্সপ্রেস ওয়ে হয়ে স্বপ্নের পদ্মা সেতু দেখতে দেখতে সময় কখন পাড় হয়ে যাবে সেটা তোমরা বুঝতেই পারবে না। ও এটা কিন্তু মনে রেখো বাসে উঠেই বাসের সুপারভাইজারকে অবশ্যই বলে নিবে তোমরা ঘোনাপাড়া বাসস্ট্যান্ড নামবে। সেখানে নেমেই দেখবে দেশের সব থেকে বড়ো চক্ষু হাসপাতাল।

বাস থেকে নেমে আরো দেখতে পাবে বিশাল আধুনিক শপিং মল এবং রাস্তার উলটো দিকে সরকারের নিজস্ব ঔষধ কারখানা এসেনসিয়াল ড্রাগের নিজস্ব কার্যালয়। এরপর তোমরা বাস থেকে যে পাশে নেমেছ সেই পাশেই দেখতে পাবে একটা তুলনামূলক সরু রাস্তা। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি ইজি বাইক অটো। সবগুলোর গন্তব্য টুঙ্গিপাড়া। অবশ্যই তোমরা ভাড়া ঠিক করে নিবে। আর এমনিতেই নিয়ম অনুযায়ী এক একজন ভাড়া ২০ টাকা। তোমরা যদি বেশি হও তাহলে অবশ্যই রিজার্ভ কত কি ঠিক করে নেওয়া কর্তব্য। যদি দেখো একটু ক্ষুধা লেগেছে তাহলে বাস থেকে যেখানে নেমেছ সেই ঘোনাপাড়ায় হালকা সেখান থেকে খেয়ে নিয়ে অটোতে উঠবে।

জাতির পিতার সমাধির একটু আগেই তোমাদের

নামিয়ে দিবে। অল্প একটু রাস্তা তোমরা হেঁটেই যেতে পারবে। প্রবেশ ফির কোনো ঝামেলা নেই। ঢুকতেই তোমার চোখ জুড়িয়ে আসবে হাজার ফুলের মেলা দেখে। দেখবে কি সুন্দর ফুলের বাগান রয়েছে। একপাশে আছে বড়ো দিঘি। সুন্দর লাল ইটের রাস্তা দিয়ে তুমি যখন সমাধি সৌধের দিকে এগিয়ে যাবে তখন তোমার মনের মধ্যে এক শিহরণ জাগা অনুভূতি হবে। যত কাছে যাবে ততই ভালো লাগবে। এরপর সাদা প্রাচীর ঘেরা মূল সামাধি সৌধের কাছে আসলেই দেখতে পাবে জাতির পিতার বিশাল একটি ম্যুরাল। ম্যুরালের পাশে দাঁড়িয়ে তোমার স্মৃতিতে রেখে দেয়ার জন্য তুলে নিতে পারো ছবি। এরপর জাতির পিতার সমাধির মূল অংশে প্রবেশ করবে। দেখবে অন্যরকম শান্তি পাচ্ছ। তোমার মনে পড়বে সেই মানুষটির কথা যার বজ্রকণ্ঠে বাঙালি জাতির নতুন ইতিহাস লেখা হয়েছিল। তিনি এই শান্তির টুঙ্গিপাড়ায় ছায়াশীতল পারিবারিক আঙিনায় ঘুমিয়ে আছেন। উনাকে অবশ্যই সম্মান জানাতে হবে। এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে এই মানুষটি আমাদের প্রিয় নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর জীবনের সব থেকে উল্লেখযোগ্য সময় দেশের মানুষের অধিকার আদায়ে সোচ্চার ছিলেন। আর তাঁর এই আন্দোলন কেনোভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক সরকার মেনে নেয়নি। যার ফলে আমাদের প্রিয় নেতাকে কারাগারে থাকতে হয়েছে।

জাতির পিতার সমাধি সৌধে সম্মান জানিয়ে তুমি কিছুক্ষণ নীরবে ভাবতে পারো। মনে আসবে অনেক কিছু। ঘুরে দেখতে পারো সমাধি সৌধের কমপ্লেক্স। পাশেই একটি জাদুঘর আছে। সেখানে রাখা আছে বিরল সব কিছু। জাতির পিতার ব্যবহার্য বেশ কিছু জিনিস। এই লেখায় সব বলব না। তোমরা নিজেরাই খুঁজে নিবে ইতিহাস। জানতে পারবে একটি কালো অন্ধকার সময়ের গল্প। মনে তোমার রাগ হবে, হবে কষ্ট। বাকিটুকু না হয় সেখানে গিয়ে দেখো। তুমি যখন জাতির পিতার সেই ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ শ্রবণ করো, কেমন লাগে তখন! মনে হয় দেশটাকে খুব ভালোবাসি? মনে হয় এই মানুষটি না হলে আমাদের পরিচয় তৈরি হতো না। আমরা আজীবন দাসত্বের শিকলে বন্দি থাকতাম।

জাতির পিতার সমাধি সৌধ দেখে আবার পুণরায় ফিরে আসতে হবে ঘোনাপাড়ায়। ঠিক রাস্তার উলটোদিকে রয়েছে বাসের কাউন্টার। সেখান থেকে টিকিট কেটে ফিরে আসতে পারো আবার ঢাকায়।

স্বপ্নের পদ্মা সেতু তৈরির কারণে তোমার যাতায়াতের সময় অনেক কম লাগবে। জাতির পিতার সমাধি সৌধ মাজারে ঢাকা থেকে যেতে তোমার সময় লাগবে দুই ঘণ্টার একটু বেশি। তারপর আবার ঢাকায় ফিরে আসতে তেমনি সময় লাগবে। ■

সহ-সম্পাদক, সময় প্রতিদিন টুয়েন্টিফোর ডটকম

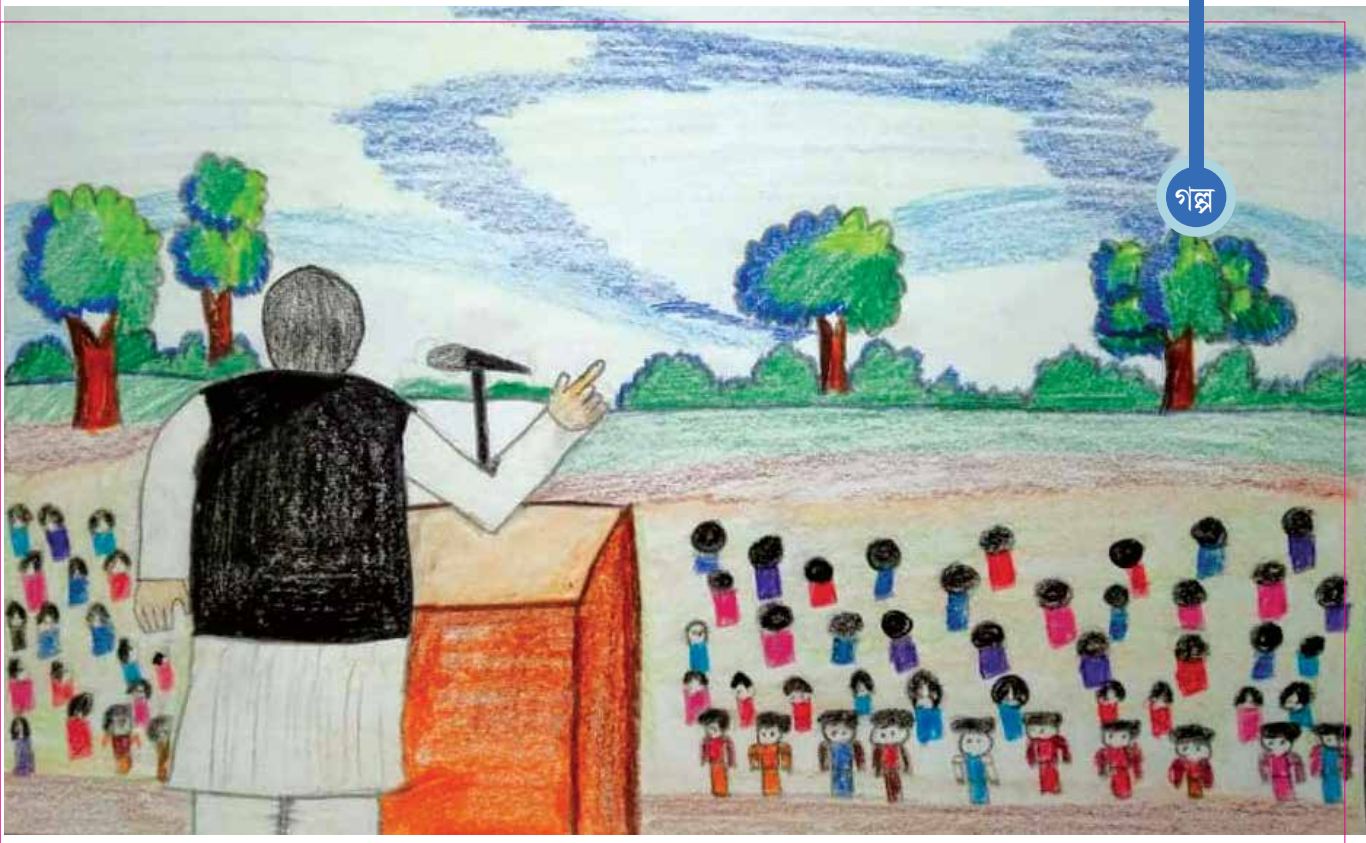

জয়া ওয়ালিয়া, পঞ্চম শ্রেণি, জামালপুর জিলা স্কুল

সেই বজ্রকণ্ঠ

মমতাজ আহাম্মদ

ছুটছে মানুষ। এত মানুষ আর কখনো দেখেনি মতি। কোনো এক জাদুকরের ডাকে যেন হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ পাগলের মতো ছুটে চলছে। সেই দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ। কিশোর মতি অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে মানুষ দেখে। মানুষগুলোর চোখেমুখে ঝিলিক দিচ্ছে এক অন্যরকম আলোর ছটা। তাদের মুখগুলো দৃঢ় প্রত্যয়ী। হাতগুলো মুষ্ঠিবদ্ধ।

বাবার সাথে গতকাল গ্রাম থেকে ঢাকা শহর দেখতে এসেছে মতি। সে এ শহরের কিছুই চিনে না। এখানে এক চাচার বাসায় উঠেছে তারা। খুব সকালে বাবা চাচার সাথে বেরিয়ে গেছে। গ্রামের ছেলে মতির বুক ভরা কৌতূহল। সে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। এসে মুক্ত বাতাসে লম্বা একটা নিশ্বাস নিয়েছে। আহ! স্বাধীনতার এত আনন্দ! আনন্দে চিকচিক করে ওঠে মতি মিয়ার চোখ। তার কিশোর বুকে স্বপ্নেরা ডালপালা মেলতে থাকে।

ঠিক সেই সময় তার খেয়াল হলো মানুষ কেমন পাগলের মতো যেন কোথায় ছুটছে। কোথায় যাচ্ছে তারা, কেন যাচ্ছে, কে তাদের ডাকছে? কিশোর মনে অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকে। তবে কোনো প্রশ্নেরই উত্তর পায় না সে। এমন সময় সে দেখতে পায় পাশের ঘর থেকে তার বয়েসি একটি ছেলে বেরিয়ে এসেছে। মতি তাকে থামায়।

'একটা কতা হুনবা?'

'কী?'

'মানুষগুলা কই যাইতাছে?'

'ক্যা, তুমি কিছু জানো না?' অবাক হয়ে মতিকে পালটা প্রশ্ন করে ছেলেটা।

'জানমু কেমনে, আমি তো গেরাম থেইকা আইছি।'

'অ। আইজকা রেসকোর্সের ময়দানে ভাষণ দিবো শেখ সাহেব। সেই ভাষণ হোননের লাইগাই মানুষ অমনে ছুটতাছে।'

এবার টনক নড়ে মতির। আরে সে তো স্যারদের মুখে শেখ সাহেবের কথা অনেক শুনেছে। যিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য সারা জীবন ধরে লড়াই করে যাচ্ছেন শাষকের বিরুদ্ধে। যতবারই মতি স্যারদের মুখে তাঁর কথা শুনেছে, ততবারই তার কল্পনায় একটি ছবি ভেসে উঠেছে। পত্রিকায় তাঁর ছবি দেখেছে মতি। কী সুন্দর তাঁর চেহারা। কী মায়াময় তাঁর হাসি। দেখলেই মনে হয় তিনি তো আমাদেরই লোক।

ছেলেটির কথা শুনে মতি মিয়ার চোখে মুখে আবার সেই স্বপ্নটা ঝিলিক দিয়ে ওঠে। আর রংধনুর সাত রং যেন খেলা করতে থাকে মতি মিয়ার চোখে। মনে ছড়িয়ে পড়ে খুশির ঢেউ।

'আমিও ভাষণ হুনতে যাইতাছি।' বলল ছেলেটা। তার কথায় যেন ছলকে ওঠে মতি মিয়ার বুকের রক্ত। এই তো সুযোগ। এ এক মোক্ষম সুযোগ। এ সুযোগ তো হেলায় হারানো যাবে না।

'আমারে নিবা তুমার সাথে?' আশায় বুক বেঁধে প্রশ্ন করে মতি।

'তুমি যাইবা?'

'হ, যামু। আমার স্বপ্ন উনারে সামনাসামনি দেখা।'

'চল তাইলে আমার লগে।'

মতি আর দেরি করে না। লাখো জনতার ভিড়ে সে আর ছেলেটি মিশে যায়। চলতে চলতে তার সাথে কথা বলতে থাকে মতি। জেনে যায় তার নাম আবু। সেও তার মতো ইশকুলে পড়ে। বিরামহীন ছুটে চলা তাদের। ছুটতে ছুটতে তারা দূর থেকেই মাইকের আওয়াজ শুনতে পায়। মতি বুঝতে পারে তারা রেসকোর্স ময়দানের কাছাকাছি এসে পড়েছে। এদিকে ভিড় আরো বেশি। যেন লাখো জনতা ছুটছে হ্যামিলনের বংশীবাদকের বাঁশির সুরে সুরে।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলে মতি আর আবু। এক সময় ময়দানে এসে পড়ে তারা। সেখানে তখন লোকে লোকারণ্য। কোথাও ঠাঁই নাই এমন একটি অবস্থা। মানুষের ফাঁকে ফাঁকে এগিয়ে চলে তারা মঞ্চের কাছাকাছি। ছোটো বলে তাদের কেউ কিছু বলে না। কেউ তাদের বাধাও দেয় না।

'এক্কেবারে সামনে চল যাই। ওনারে আমি সামনে থেইকা দেখতে চাই।' মতি মিয়ার কণ্ঠে আকুতি ঝরে পড়ে।

'হ হ, তাই যাইতাছি।' বলে ওঠে আবু।

এক সময় তারা জনতার সমুদ্রের সেই উত্তাল ঢেউ ঠেলে চলে আসে একেবারে মঞ্চের সামনে। এখান থেকে মঞ্চটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মতি মিয়ার মনে টগবগ করে ফুটতে থাকে যেন উত্তেজনার খই। তার আর তর সইছে না। এক সময় তিনি এলেন। তাঁকে দেখে হর্ষধ্বনী করে উঠল জনতা। সেই আওয়াজে যেন ফেটে যেতে চাইল আকাশ। সবার সাথে সাথে মতি মিয়া আর আবুও চেঁচিয়ে উঠল। তাদের খুদে কণ্ঠের চিৎকার মিলিয়ে গেল লাখো মানুষের চিৎকারের মাঝে।

তারপর তিনি বক্তৃতা দেয়া শুরু করলেন। তাঁর ভরাট কণ্ঠস্বরে গম গম করে উঠল পুরো এলাকা। তাঁর একেকটা কথায় সম্মতিতে গর্জে উঠছে জনতা। লাখো লাখো মানুষের বুক ভরা আশা। তাদের চোখেমুখে স্বপ্ন খেলা করছে। তারা একটা স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখছে।

তারপর এল সেই নির্দেশ। তিনি বললেন, 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ্, জয়বাংলা।'

সেই বজ্রকণ্ঠ মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল বাংলার আনাচে-কানাচে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো মতি মিয়াও শুনল সেই ভাষণ। তারও ইচ্ছে হলো স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে। মতি আর আবু তাঁকে আরো কাছ থেকে দেখার জন্য এগিয়ে গেল। কিন্তু তারা মানুষের জন্য আর এগুতে পারল না।

এক সময় আবু বলল, চল যাইগা। দেরি দেখলে আব্বায় আবার খুঁজাখুঁজি করব।

মতি আর আবু ফিরে আসছে। কিন্তু মতি মিয়ার কানে এখনো বাজছে সেই বজ্রকণ্ঠ। ...আর যদি একটি গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়...।

কী অসাধারণ এক কণ্ঠ! তিনি এক মহান নেতা। মতি মিয়াও স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখতে থাকে। তার চোখে খেলা করতে থাকে মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের ছবি। এ ছবি গেথে আছে লক্ষ-কোটি বাঙালির বুকে। ■

শিশু সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

শক্তি ও প্রেরণার মাস

খায়রুল বাবুই

আগস্ট কেন বাঙালি জাতির জন্য শোকের? একই সঙ্গে শক্তি ও প্রেরণারও? কারণ, এ মাসেই রক্তাক্ত হয়েছিল ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়িটি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে নিজ বাড়িতে সপরিবারে নিহত হন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঘাতকের বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় বাড়িটির দরজা, জানালা ও দেয়াল। রক্তের স্রোতে ভেসে যায় ঘর, সিঁড়ি। সদ্য স্বাধীন হওয়া এদেশে তখন নেমে আসে অনিশ্চয়তার অন্ধকার।

বছর ঘুরে আগস্ট মাস এলেই অদৃশ্য রক্তক্ষরণ হয় আমাদের বুকে। ফিরে আসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যার ভয়াবহ স্মৃতি। প্রত্যেক বাঙালির বুক চিরে বের হয় প্রিয় নেতা এবং প্রিয় মানুষদের হারানোর দীর্ঘশ্বাস।

শেখ মুজিব কে ছিলেন, কী ছিলেন, তোমরা নিশ্চয়ই জানো।

তিনি ছিলেন পরাধীন বাঙালি জাতির মুক্তি আন্দোলনের মহানায়ক, লাঞ্ছিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের মহান নেতা, বাংলা ও বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান। হাজার বছরের শাসন-শোষণ আর পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে বাঙালি জাতিকে তিনি এনে দিয়েছেন স্বাধীনতা ও

সার্বভৌমত্ব। এনে দিয়েছেন লাল-সবুজের পতাকা।

আগস্টের সেই কালরাতে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ভাই শেখ আবু নাসের, জাতির পিতার বড়ো ছেলে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপটেন শেখ কামাল, দ্বিতীয় ছেলে মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল। হায়েনাদের বুলেট থেকে রেহাই পায়নি বঙ্গবন্ধুর ছোটো ছেলে শিশু শেখ রাসেলও। ঘাতকেরা নির্মমভাবে হত্যা করেছিল বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের আঠারো জন সদস্যকে। ওই সময়ে বিদেশে অবস্থানের কারণে ঘাতকের বুলেট থেকে ভাগ্যক্রমে রেহাই পান বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা।

আগস্ট তাই আমাদের কাছে এক অবিস্মরণীয় শোকের মাস। আগস্ট এলেই আমরা আরো গভীর ভাবে স্মরণ করি বঙ্গবন্ধুর পরিবারের নিহত প্রত্যেক সদস্যকে। স্মরণে শ্রদ্ধায় মনের সুউচ্চ আসনে বসাই সোনার বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, বিশ্বনেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। ১৫ই আগস্ট আমরা জাতীয় শোক দিবস পালন করি।

আগস্ট বিভিন্ন কারণে আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩০ সালের ৮ই আগস্ট জন্মেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। আর ১৯৪৯ সালের ৫ই আগস্ট তাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা, ক্রীড়া সংগঠক শেখ কামালের জন্মদিন। তাঁদের দুজনের জীবনাদর্শ, দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ আর মমত্ববোধ থেকেও আমাদের শেখার আছে অনেক কিছু। কিন্তু তাদের দুজনের জন্মের আনন্দময় স্মৃতিতে আমরা উচ্ছ্বসিত হতে পারি না। কারণ ১৫ই আগস্ট পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে জাতির পিতার নৃশংসভাবে নিহত হওয়ার মর্মান্তিক স্মৃতি বেদনাই আমাদের ভারাক্রান্ত করে তোলে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সরকার জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যাকারীদের বিচার করেছে। খুনিদের বিচার ও সাজা প্রদানের মাধ্যমে কলঙ্কমুক্ত হয়েছে জাতি।

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমার সবচেয়ে বড়ো শক্তি আমি আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি। সবচেয়ে বড় দুর্বলতা আমি তাদেরকে খুব বেশি ভালোবাসি।'

শেখ মুজিবুর রহমানের মতো মহানায়কেরা বেঁচে থাকেন ইতিহাসের পাতায়, কোটি মানুষের মনের খাতায়। তাই, আগস্টের শোককে শক্তি আর প্রেরণার উৎস বানিয়ে আমরা এগিয়ে যাব। এই দেশটাকে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করব, নিজ নিজ অবস্থানে থেকে, সততার সঙ্গে, দেশপ্রেমের ব্রত নিয়ে। কারণ, আমরা ভালোবাসি আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে। ভালোবাসি প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।■

শিশু সাহিত্যিক ও প্রযোজক, বাংলাভিশন টেলিভিশন

খোকা

সাকিবুল আলম

খোকা তাঁর নাম
টুঙ্গিপাড়া গ্রাম
তাঁর সুনাম ছড়িয়ে আছে
সারা বিশ্ব জোড়া।

তাঁকে নিয়ে গর্ব করি
আমরা সকল বাঙালি
স্বাধীনতার মহানায়ক
তাঁকে হৃদয় দিয়ে মানি।

৭ম শ্রেণি, মোহাম্মদপুর উচ্চ বিদ্যালয়
দেবিদ্বার, কুমিল্লা

বঙ্গবন্ধু আইল্যান্ড : প্রাকৃতিক স্বর্গরাজ্য

শাহানা আফরোজ

বঙ্গবন্ধু আইল্যান্ড যার ডাক নাম বঙ্গবন্ধু দ্বীপ, বঙ্গবন্ধু চর এবং বঙ্গবন্ধু সমুদ্র সৈকত নামে পরিচিত। খুলনার মংলা উপজেলার দুবলার চর থেকে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে ৭.৮৪ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট এই দ্বীপটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দুই মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। দ্বীপটি একসময় ছিল পানি ভর্তি। প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯৯২ সালে। মৎস্য শিকারি মালেক ফরাজীসহ দুইজন জেলে প্রথম এই দ্বীপে অবতরণ করেন। বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ ভক্ত হওয়ায় তিনি সেই সময়ই বঙ্গবন্ধু দ্বীপ নামে একটি সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেন। এরপর দ্বীপটির আর কোনো খবর ছিল না।

পরবর্তীতে ফেসবুকে দ্বীপটি সম্পর্কে একটি পোস্ট দেখে এটি নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেন গবেষকরা। ১৯৭০ সালের পর থেকেই গুগোল স্যাটেলাইটে বঙ্গবন্ধু আইল্যান্ড বা বঙ্গবন্ধু সমুদ্র

সৈকতটি স্যাটেলাইটে দেখা যেত। বিভিন্ন ঋতুতে দ্বীপটির পরিবর্তন হতো। যেমন– বর্ষাকালে দেখা যেত দ্বীপটি সম্পূর্ণ তলিয়ে গেছে। তবে ১৯৯০ সালের পর থেকে এই দ্বীপটি আর বিভিন্ন সময়ে সাগরের নিচে তলিয়ে যায়নি। ২০০৬ থেকে ২০০৭ সালের পর এই দ্বীপটির আয়তন আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবেষকদের তথ্যানুযায়ী, গত ২৫ বছরে দ্বীপের পরিধি অনেকটাই বিস্তৃত হয়েছে। এই দ্বীপে সর্বমোট নয় কিলোমিটার লম্বা সাগর সৈকত রয়েছে। কোনো চোরাবালির চিহ্ন নেই। অন্যান্য সাগর সৈকতের তুলনায় এই সৈকতের পানি এতটাই স্বচ্ছ যে এখানে সহজেই ভয়হীনভাবে সাঁতার কাটা যায়।

বঙ্গবন্ধু আইল্যান্ড-এ বিভিন্ন রকমের ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট রয়েছে। যেগুলো আস্তে আস্তে বড়ো হচ্ছে এবং আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন মৃত্তিকা বিজ্ঞানের জরিপ থেকে জানা যায়, এখানকার মাটি এতটাই ভালো যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থান তৈরি হতে অনেক কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এই দ্বীপের প্রধান আকর্ষণ লাল কাঁকড়া যখন সৈকত জুড়ে হাঁটে দূর থেকে দেখে মনে হয় লাল রংয়ের সৈকত। তবে দ্বীপে কোনো সরীসৃপ পাওয়া যায়নি। সরীসৃপ বাদে সব মিলিয়ে প্রায় ৬০ থেকে ৭০টি জীববৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। বাঘের কোনো হদিস না পেলেও হরিণের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তাছাড়া বিভিন্ন রকমের প্লাংকটন প্রাণী এখানে রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু আইল্যাণ্ডের সবচেয়ে ভালো দিক হলো এই দ্বীপে প্রখর রোদের তাপমাত্রার ভিতরেও বেশি একটা গরম লাগে না। কেননা এই দ্বীপের বালু একটু অন্যরকম। যার ফলে এখানে অতিরিক্ত তাপের মধ্যেও অনেক গরম লাগবে না। এছাড়াও এই দ্বীপের আশপাশে ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত কোনো মানববসতি নেই। যার কারণে এই দ্বীপটি অনেকটাই সুনসান। ■

ধাতব মুদ্রায় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি

বিশাল এক ক্যানভাস। প্রতিটি স্তরে স্তরে জুড়ে দেয়া হয়েছে এক টাকার ধাতব মুদ্রা। কিছু মুদ্রা বসানো হয়েছে হুবহু। দেওয়া হয়নি ভিন্ন কোনো রঙের প্রলেপ। বাকিগুলোতে দেয়া হয়েছে কালো রং। এভাবে দশ হাজার ধাতব মুদ্রার সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির বাইরের দেয়ালে উপস্থাপিত হয়েছে প্রতিকৃতিটি। এটি তৈরি করেছেন সাজ্জাদ হোসেন সাঈদ। কক্সবাজারের রামু উপজেলার তরুণ এই শিল্পীর দুই বছরের নিরন্তর শ্রমের ফসল এটি। নতুন কিছু করার প্রয়াসে এক টাকা মূল্যের ১০ হাজার ধাতব মুদ্রায় তৈরি হয়েছে এই কোলাজ চিত্রকর্ম। এর আগে চিত্রকর্ম, ভাস্কর্যসহ নানা মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি দেখা যায়। তবে এই প্রথম এক টাকার মুদ্রায় গড়া হলো বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি। ব্যতিক্রমী ভাবে উপস্থাপিত জাতির পিতার মুখচ্ছবি সবার হৃদয়কে নাড়িয়ে দেয়। ■

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

বাংলাদেশের জয়

প্রতি বছরের মতো এ বছরও আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে (আইএমও) বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে ছয় খুদে গণিতবিদ অংশ নেয়। ৬৩তম আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয় নরওয়ের অসলোতে। ১০ই জুলাই অসলো শহরে উদ্‌বোধন পর্বের মাধ্যমে শুরু হয়ে ১৬ই জুলাই শেষ হয় এই আসর।

বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষার্থীরা এই আসরে একটি ব্রোঞ্জপদক ও পাঁচটি সম্মানজনক স্বীকৃতি অর্জন করে। এবারের গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দল দলীয়ভাবে মোট ১১৫ নম্বর পেয়ে ১০৪টি দেশের মধ্যে ৫৭তম স্থান লাভ করেছে। আইএমও তে দলীয়ভাবে বাংলাদেশ দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নম্বর এটি। এর আগে ২০২০ সালে ১১৮ নম্বর পায় বাংলাদেশ।

এবারে বাংলাদেশ দলের হয়ে ব্রোঞ্জপদক পেয়েছেন সরকারি আনন্দমোহন কলেজের তাহজিব হোসেন খান। তার প্রাপ্ত নম্বর ২৩। সম্মানজনক স্বীকৃতি পেয়েছেন নটর ডেম কলেজের তাহমিদ হামিম চৌধুরী পেয়েছে ২১, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের মো. ফোয়াদ আল আলম যার প্রাপ্ত নম্বর ২১, সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজের এস এম এ নাহিয়ান পেয়েছে ১৯, নটর ডেম কলেজের মো. আশরাফুল ইসলাম ফাহিম নম্বর ১৭ ও ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের নুজহাত আহমেদ দিশার নম্বর ১৪।

এ বছর দলীয়ভাবে ২৫২ নম্বরের মধ্যে ২৫২ নম্বর পেয়ে ৬টি সোনার পদক জিতে নেয় চীন। ১৯৯৪ সালের পর আর কোনো দেশ ২৫২তে পূর্ণ নম্বর পায়নি। দক্ষিণ কোরিয়া ২০৮ নম্বর নিয়ে দ্বিতীয়, যুক্তরাষ্ট্র ২০৭ নিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। বাংলাদেশের প্রতিবেশি দেশ ভারত ১৬৫ নম্বর নিয়ে ২৪তম, শ্রীলঙ্কা ৭৭ নম্বর পেয়ে ৭৩তম, পাকিস্তান ৫৪ নম্বর নিয়ে ৮২তম ও নেপাল ২৭ নম্বর নিয়ে ৮৯তম স্থান অর্জন করেছে। আয়োজক দেশ নরওয়ে ৬১তম স্থান অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ ২০০৫ সাল থেকে আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে অংশ নিচ্ছে। এবারেরসহ বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে ১টি সোনা, ৭টি রুপা, ৩২টি ব্রোঞ্জ ও ৩৮টি সম্মানজনক স্বীকৃতি অর্জন করেন। ■

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

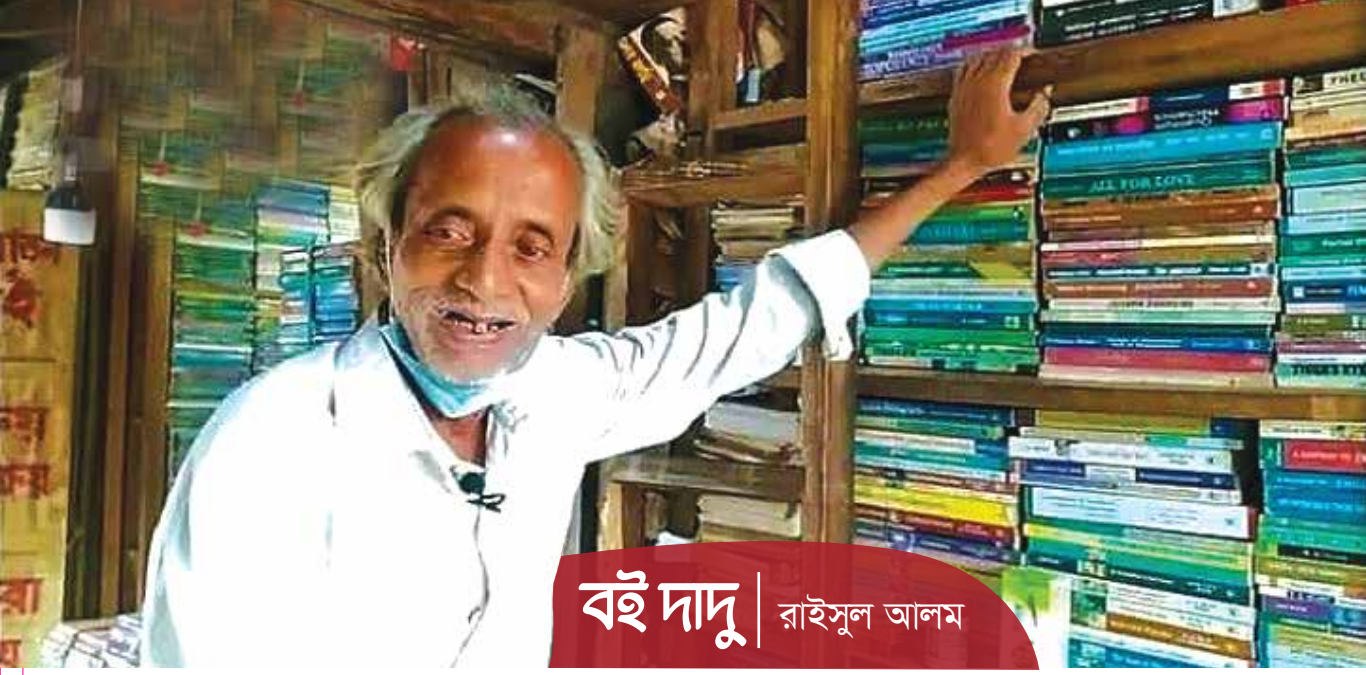

বই দাদু | রাইসুল আলম

পারিবারিক নানা সমস্যার কারণে স্কুলের গণ্ডি পার করতে পারেননি। তারপরও বইয়ের সঙ্গে সখ্যতার কোনো কমতি ছিল না তার। জীবিকার প্রয়োজনে শেষে পুরনো বই কেনার ঝোঁক আর বইপড়ার নেশা মাথায় চেপে বসে তার। এমনই একজন বইপ্রেমী মানুষ রংপুরের ওমর শরীফ

শরীফ শৈশব থেকেই ছিলেন বইপোকা। ছেলেবেলায় টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে বই কেনার শখ ছিল তার। বাংলা সাহিত্যের প্রধান লেখকদের অধিকাংশ বই তার পড়া। এমনকি উইলিয়াম শেকস্পিয়ার, ম্যাক্সিম গোর্কি, টলস্টয়ের বইও আছে তার পাঠ্য তালিকায়।

ওমর শরীফ নিজে পড়া শেষ হলে আরেকজনকে পড়তে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বই ভাড়া দেওয়ার চিন্তা মাথায় আসে। ২০০১ সাল থেকে নিজের বই পড়ার আগ্রহটা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পুরাতন বই সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। এক সময় তার সংগ্রহশালায় যখন বই বাড়তে থাকে তখন অন্যদের বই পড়তে দিতে শুরু করেন নামমাত্র ভাড়ায়। এভাবে তিনি লক্ষাধিক পাঠক তৈরি করেন। সেই বই নিয়েই তার ঠাঁই হয় শহিদ জররেজ মার্কেটে। দীর্ঘদিনের চেনা জানা বই ব্যাবসায়ী রুহুল আমিন তাকে বিনামূল্যে নিজের দোকানের একটি অংশ ছেড়ে দেন। এরপরই শুরু হয় পাঠকের সঙ্গে তার বই লেনদেনের সম্পর্ক।

শুরুতে মাত্র দুই টাকার বিনিময়ে শিক্ষার্থীসহ নানা পেশার পাঠককে বই ভাড়া দিতেন ওমর শরীফ। এভাবেই শুরু তার বইয়ের ব্যাবসা, যা আজও থামেনি।

এখন অবশ্য বইয়ের প্রকারভেদে তা বেড়ে ১০ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে। পাঠকদের আগ্রহ বাড়াতে কখনো টাকা ছাড়াও বই দেন তিনি। আবার কারো যদি বই পড়ে ভালো লাগে, তাহলে সেই বইয়ের ভাড়ার টাকা ফেরত দেন। তার কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া বই কেউ ফেরত নাও দিতে পারেন। তবে অধিকাংশ পাঠকই ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে বই ফেরত দিয়ে নতুন করে বই নিয়ে যান বলে জানান তিনি। এখন তার ভাণ্ডারে আছে প্রায় পাঁচ হাজার বই। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বইয়ের প্রতি অদম্য আগ্রহ তাকে পরিচিত করেছে 'বই দাদু' নামে।

তিনি এক সময় বিভিন্ন বইয়ের দোকানের সামনে ঘুরতেন। সেখানে বইপ্রেমী কেউ এলে পুরনো বই বিক্রি করবে কি-না জানতে চাইতেন। কোথাও সন্ধান পেলে ছুটে যেতেন তাদের বাড়িতে। কম দামে বই কিনে আনতেন। আবার পুরোনো কাগজ-বিক্রেতা বা ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকেও বই কিনতেন। এভাবে সংগ্রহ করতে করতে বইয়ের এই বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তোলেন। ওমর শরীফের বইয়ের প্রতি অগাধ ভালোবাসা একুশ বছরে লক্ষাধিক পাঠক তৈরি হয়েছে। তার ব্যতিক্রমী উদ্যোগে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও তরুণেরা নামমাত্র ভাড়ায় বই পড়তে পারছেন। এতে যেমন পাঠাভ্যাস বাড়বে, সঙ্গে তরুণদের মধ্যে বই সংগ্রহের অভ্যাসও গড়ে উঠবে। ■

প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

বাবার ভরসা মুনিরা

নবারুণের বন্ধুরা, তোমাদেরকে আজ এমন এক মেয়ের গল্প শোনাব, যে রাত-দিন সংগ্রাম করে চলেছে নিজের স্বপ্নকে সত্যি করতে। ১২ বছর বয়সে যে নরম হাতে তুলে নিয়েছে খেয়া পারাপারের শক্ত বইঠা, পাশাপাশি চলছে পড়াশোনা।

নাম হাফসা আক্তার মুনিরা। বাড়ি পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলার চরবাসরী গ্রামে। বাবা মনির হোসেন প্রায় অন্ধ, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী। মা নেই। পাঁচ বছর বয়সেই সংসারের কাজে হাত লাগাতে হয়েছে মুনিরার। দারিদ্র্যের মধ্যে বড়ো হওয়া মুনিরার কাঁধে এখন সংসারের বোঝা। নৌকা চালিয়ে খেয়া পারাপার মুনিরার জীবিকার উৎস।

তাই বলে উপার্জন করতে গিয়ে পড়ালেখা বন্ধ করেনি মুনিরা। সে এখন কাউখালী নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ছে। তার স্বপ্ন পড়াশোনা করে অনেক বড়ো হবে। খেয়া পারাপার দিয়ে সকালটা শুরু হয় মুনিরার। এরপর স্কুলে যায়। ক্লাস শেষে দুপুরে বাসায় ফিরে রান্না-বান্নাসহ সংসারের সব কাজ করে নিজ হাতে। এই সময়টাতে খেয়া পারাপারের চেষ্টা করেন বাবা মনির হোসেন। দুপুরের পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আবার বইঠা হাতে যাত্রী পারাপার করে মুনিরা। প্রতিদিন গড়ে তিনশ টাকার মতো আয় হয়। দিনে সময় নেই তাই রাতে পড়াশোনা করে। এভাবেই চলছে বাবাকে নিয়ে তার সংগ্রামী জীবন। আর হয়ে উঠেছে প্রতিবন্ধী বাবার একমাত্র ভরসার আশ্রয়। আমাদের সমাজের সংগ্রামী এসব মুনিরারা থেমে থাকে না, থেমে থাকবে না, ওরা এগিয়ে যাবেই। ওদের দৃঢ় মনোবল আর প্রবল ইচ্ছশক্তিই ওদেরকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। ■

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

দুধের পুষ্টিতথ্য

পৃথিবীর সব খাদ্যের সেরা খাদ্য দুধ। সর্বোচ্চ পুষ্টিমানের জন্যই দুধের শ্রেষ্ঠত্ব। দুধের অপরিহার্য উপাদান ল্যাকটোজ– যা দৈহিক গঠন, বিকাশ ও মেধা বৃদ্ধিতে সহায়ক। মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার মূল উপাদান দুধ। ছোট্ট বন্ধুরা, আজকে তোমাদেরকে জানাবো দুধের পুষ্টিগুণ ও উপকারিতা সম্পর্কে।

দুধে আছে ৮ গ্রামের উচ্চমানের প্রোটিন। আমাদের খাবারের ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়ামের অন্যতম উৎস যা আমাদের অনেকের দৈনন্দিন খাবারে থাকে না। ভিটামিন 'বি১২' ভিটামিন 'এ'-এর রিবোফ্লাভিনের একটি ভালো উৎস। এক গ্লাস দুধে এক কাপ শিমের মতো ফসফরাস থাকে। দুধে আছে দৈনিক প্রয়োজনের ১০ শতাংশ নিয়াসিন বা ভিটামিন 'বি৩'।

আরো আছে– ১. ক্যালসিয়াম, যা দাঁত ও হাড়ের গঠন মজবুত করে। প্রতিদিন দুধ পান করলে দাঁত ক্ষয়ে যাওয়া, দাঁতে পোকা ও হলুদ ছোপ পড়া, হাড় ক্ষয়ের মতো সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে।

২. প্রতিদিন এক গ্লাস দুধ পানে অন্যান্য খাবারের চাহিদা অনেকাংশে মিটে যায়। নাশতার সময় দুধ পান করলে অনেক সময় ধরে সেটা পেটে থাকে। তাই ক্ষুধাও কম লাগে। এছাড়া দুধ পানের ফলে দেহের অনেক ধরনের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয়। তাই ওজন বেড়ে যাওয়ার সমস্যায় ভুগলে এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে কম সময়ে ওজন কমাতে চাইলে, প্রতিদিনের ডায়েটে দুধ রাখতে হবে।

৩. দুধে থাকা ভিটামিন ও মিনারেল ফিটনেস বাড়ায় এবং মানসিক চাপ দূর করতে সহায়তা করে। দুধ পানে ঘুমের উদ্রেক হয়, যার ফলে মস্তিষ্ক শিথিল থাকে ও মানসিক চাপমুক্ত হয়। সারাদিনের মানসিক চাপ দূর করে শান্তির ঘুম নিশ্চিত করতে প্রতিদিন রাতে এক গ্লাস কুসুম গরম দুধ পান করা উচিত

৪. দুধ শরীরে রি-হাইড্রেট করতে সাহায্য করে। ডিহাইড্রেশনের সমস্যায় ভুগলে এক গ্লাস দুধ পান করে নাও। সুস্থ বোধ করবে

৫. কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে এবং দুধজাতীয় খাবারে অ্যালার্জি না থাকলে রাতে ঘুমনোর আগে প্রতিদিন এক গ্লাস গরম দুধ পান করো।

৬. দুধে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, যা মাংসপেশির গঠনে সহায়তা করে ও মাংসপেশির আড়ষ্টতা দূর করে। নিয়মিত ব্যায়ামের ক্ষেত্রে প্রতিদিন এক থেকে দুই গ্লাস দুধ খুবই উপকারী। শিশুদের মাংসপেশির গঠন উন্নত করতেও প্রতিদিন দুধ পান করা উচিত।

৭. প্রতিদিন আমরা এমন অনেক ধরনের খাবার খাই যার ফলে অ্যাসিডিটি হয় ও বুক জ্বালাপোড়া করে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ সমাধান, প্রতিদিন দুধ পান করা। দুধ পাকস্থলী ঠান্ডা রাখে ও বুক জ্বালাপোড়ার সমস্যা দূর হয়।

৮. দুধে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও মিনারেল রয়েছে, যা দেহের ইমিউনিটি সিস্টেম উন্নত করে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। প্রতিদিন দুধ পানে ত্বক নরম, কোমল ও মসৃণ হয়।

তাই বন্ধুরা, সুস্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত দুধ পান করবে।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

শুধু পা দিয়েই জীবন জয়

জয়পুরহাটের খেতলাল উপজেলার বায়েজীদ পারমানিকের কন্যা বিউটি খাতুন। ছোটো দুটি হাত নিয়ে জন্মেছেন তিনি। যা দিয়ে লিখতে বা কোনো কাজ করতে পারেন না। তবে থেমে যাননি বিউটি। পা দিয়ে চলছে তার পড়াশোনা। বাবা মেয়ের পাশে থেকে চেষ্টা করেছেন মেয়েকে এগিয়ে নিতে। শিখিয়েছেন পড়াশোনা ও পা দিয়ে লেখা। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ধাপ পেরিয়ে মেধাবী বিউটি এখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্রী। দুই হাতে ত্রুটি থাকার পরও জীবনসংগ্রামে এতদূর এগিয়ে আসায় বিউটিকে নিয়ে গর্ব করেন তার ক্যাম্পাসের শিক্ষক ও বন্ধুরা। বিউটি কোনো কোটায় নয় নিজ মেধায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন। মেধাবী বিউটির এমন প্রচেষ্টা সবার জন্য অনুকরণীয়।

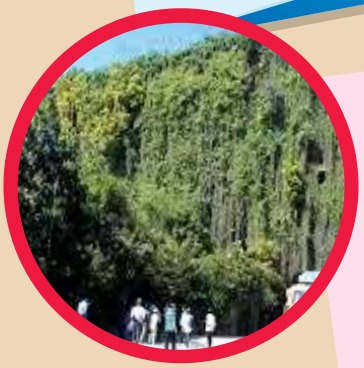

শীতল কারখানা

রংপুরের ঐতিহ্যবাহী শতরঞ্জি তৈরির কারখানা কারুপণ্য লিমিটেড। এখানে প্রবেশের সময় দূর থেকে দেখলে মনে হবে সবুজের সমারোহে ঘেরা কোনো বাগান বা বিনোদন কেন্দ্র। কিন্তু এটি আসলে কারুপণ্যের গ্রিন ফ্যাক্টরি। গেট দিয়ে ঢুকলেই আট লাখ বর্গফুটের বিশাল সীমানা। এর মাঝখানে কারখানার সাত তলা ভবন। মজার বিষয় হলো, এই কারখানায় নেই কোনো এসি বা ফ্যান। তবুও শীতল থাকে এই ভবনটি। ভবনটির নিচতলার লবিতে পুকুরের মতো বড়ো বড়ো ৪টি জলাধার। এখানকার আয়রনমুক্ত পানি কারখানার শতরঞ্জি ডাইং-এর কাজে ব্যবহৃত হয়ে আবার আসে এই জলাধারে। কারখানার স্থাপত্য নকশায় এমন এক বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে যাতে কারখানার ভেতরে বাতাস প্রবাহিত হয়। কারখানাটি শুধু দেখতেই সুন্দর তা নয়, এখানে কর্মীদের সার্বিক খেয়াল রাখা হয়। দুপুর ও রাতের খাবার, চিকিৎসা দেখাশোনা, নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজার প্রভৃতিসহ আরো নানান সুবিধা দেওয়া হয় এখানে।

তালগাছ লাগিয়ে অনন্য কীর্তি

বন্ধুরা, আমরা সবাই জানি তালগাছ বজ্রপাত নিরোধক গাছ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশি করে তালগাছ লাগালে বজ্রপাত কম হয়। যশোরের কেশবপুর উপজেলার মেহেরপুর গ্রামের বাসিন্দা মিজানুর রহমান উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর পৈতৃক জমিতে শুরু করেন কৃষিকাজ। ২০০০ সালে নিজের জমিতে রোপণ করেছিলেন কয়েকটি তালবীজ। চারাগাছ গুলোকে বড়ো হতে দেখে তার মন আনন্দে ভরে যায়। এরপর তিনি পর্যায়ক্রমে কপোতাক্ষ নদ পাড়ের মেহেরপুর গ্রাম থেকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত বেরিবাঁধে রোপণ করেন প্রায় ২ হাজার তালবীজ। বর্তমানে সেখানে ২০ কি.মি. এলাকা জুড়ে তালগাছের সংখ্যা প্রায় ৭ হাজার। মিজানুর রহমানের বিশাল এ উদ্যোগ সকলের জন্যই অনুকরণীয়।

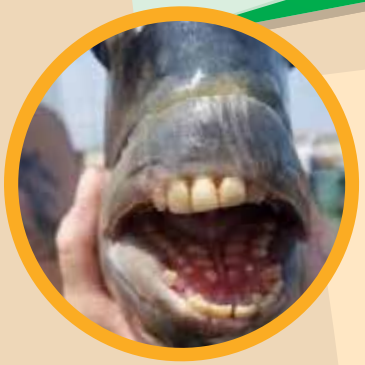

মাছের দাঁত মানুষের মতো

মাছের দাঁত মানুষের মতো হয়? হ্যাঁ বন্ধুরা, আজ তোমাদের এমনই একটি মাছের সাথে পরিচয় করে দেব। ঠিক মানুষের মতো উপরের পাটিতে এক সারি আর নিচের পাটিতে এক সারি দাঁত রয়েছে মাছটির। সম্প্রতি এমন মাছ ধরা পড়েছে এক মার্কিন ব্যক্তির জালে। অবিকল মানুষের মতো দাঁতের ওই মাছের ছবি দেখে চমকে গেছেন নেটিজেনরা। জেনেটস পিয়ার নামে এক ব্যক্তি ফেসবুকে ওই মাছের ছবি পোস্ট করেন। নর্থ ক্যারেলিনার সমুদ্রে শিপশিড প্রজাতির ওই মাছ পাওয়া যায়। গায়ে সাদা-কালো দাগ থাকায় কনভিক্ট নামেও ডাকা হয় এই প্রজাতির মাছকে। মানুষের মতোই সর্বভুক এই প্রজাতির মাছ। ওজন আড়াই থেকে সাত কেজি পর্যন্ত হতে পারে। এই প্রজাতির মাছ সামনের দাঁতগুলো শামুক ও ঝিনুকের খোলস ভাঙার কাজে ব্যবহার করে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ২.বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনের জন্য ২০২০-২১ খ্রিষ্টাব্দকে যে বর্ষ নামে ঘোষণা দেওয়া হয়, ৪.এক ধরনের জলচর পাখি, ৬.লতা, ৮.অম্লরস, ৯.পাণ্ডিত্য, ১০.দুর্বোধ্য, ১৩.উপঢৌকন

উপর-নিচ: ১.বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, ৩.কবি জীবনানন্দ দাশের একটি জনপ্রিয় কবিতা, ৫.ঠাট্টা, ৭.সহজাত বুদ্ধি, ৮. রসে পূর্ণ, ১১.দশ সংখ্যার ইংরেজি, ১২.মায়ের বাবা

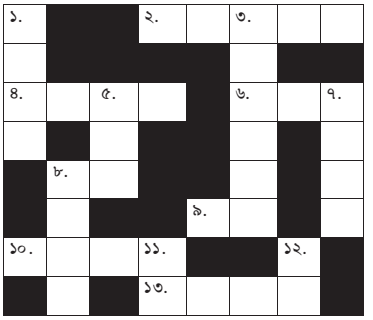

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: অসমাপ্ত আত্মজীবনী, মহামানব মাতৃভাষা আন্দোলন, অতৃপ্ত মহাজীবন, কানন

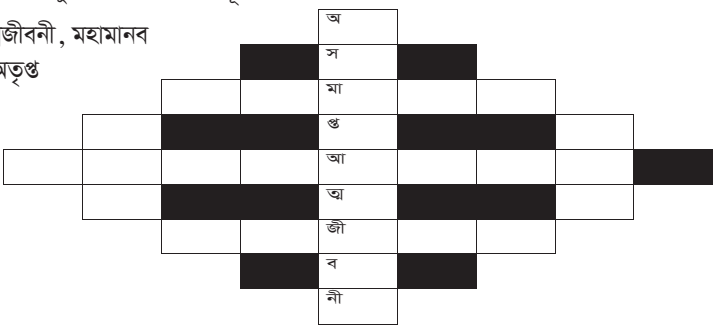

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৭১		৬৯		৬৫	৬৪		৪২	৪১
	৭৩		৬৭		৬৩	৪৪		
৮১		৭৫	৬০	৬১		৪৯		
		৭৬			৫১		৪৭	
	৭৮		৫৮			২৩		৩৭
	৯	৫৬		৫৪	২১		৩৫	
৭		১১		১৯				৩৩
	৩		১৩		১৭		৩১	৩০
৫		১		১৫		২৭		২৯

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

১	*		+	২	=	
+		*		*		*
	/	২	+		=	৩
/		-		+		-
২	*		-	৩	=	
=		=		=		=
	+	২	+		=	১০

জুলাই মাসের সমাধান

শব্দধাঁধা

টু			মু	জি	ব	ব	র্ষ
ঙ্গি					ন		
পা	ন	কৌ	ড়ি		ল	তি	কা
ড়া		তু			তা		গু
	ট	ক			সে		জ্ঞা
	স			জ্ঞা	ন		ন
খ	ট	ম	টে			না	
	সে		ন	জ	রা	না	

ছক মিলাও

				অ				
				স				
		ম	হা	মা	ন	ব		
	অ			প্ত			কা	
মা	তৃ	ভা	ষা	আ	ন্দো	ল	ন	
	প্ত			ত্ম			ন	
		ম	হা	জী	ব	ন		
				ব				
				নী				

নাম্ব্রিক্স

৭১	৭০	৬৯	৬৬	৬৫	৬৪	৪৩	৪২	৪১
৭২	৭৩	৬৮	৬৭	৬২	৬৩	৪৪	৪৫	৪০
৮১	৭৪	৭৫	৬০	৬১	৫০	৪৯	৪৬	৩৯
৮০	৭৭	৭৬	৫৯	৫২	৫১	৪৮	৪৭	৩৮
৭৯	৭৮	৫৭	৫৮	৫৩	২২	২৩	৩৬	৩৭
৮	৯	৫৬	৫৫	৫৪	২১	২৪	৩৫	৩৪
৭	১০	১১	১২	১৯	২০	২৫	৩২	৩৩
৬	৩	২	১৩	১৮	১৭	২৬	৩১	৩০
৫	৪	১	১৪	১৫	১৬	২৭	২৮	২৯

ব্রেইন ইকুয়েশন

১	*	৩	+	২	=	৫
+		*		*		*
৪	/	২	+	১	=	৩
/		-		+		-
২	*	৪	-	৩	=	৫
=		=		=		=
৩	+	২	+	৫	=	১০

ছোটোদের আঁকা

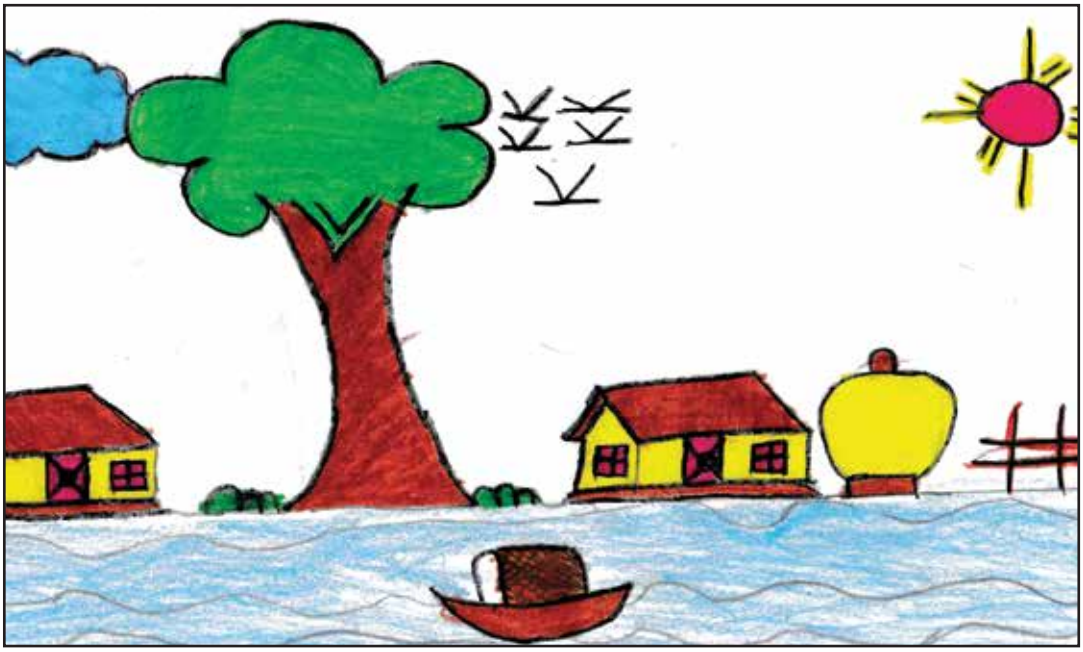

আব্দুল কাদের জিলানী, শ্রেণি কেজি, টাচ্‌স্টোন স্কুল, মিরপুর, ঢাকা

জান্নাতুল নাঈম, দশম শ্রেণি, ফসিয়ার রহমান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, পাইকগাছা, খুলনা

ছোটোদের আঁকা

ফারিন আজিজ, প্রথম শ্রেণি, আরামবাগ গালর্স স্কুল, ঢাকা

রেজওয়ান আল রাহাত, তৃতীয় শ্রেণি, স্বরলিপি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

অ্যাডহক প্রকাশনা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

করোনার বিস্তার প্রতিরোধে

নো মাস্ক নো সার্ভিস

মাস্ক নাই তো সেবাও নাই

মাস্ক ছাড়া সরকারি-বেসরকারি
প্রতিষ্ঠানে কোনো সেবা মিলবে না

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-47, No-02, August 2022, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা